৭.০৮ মঙ্গল গ্রহে – Bangla Library

৭.০৮ মঙ্গল গ্রহে – Bangla Library

মঙ্গল গ্রহে–১০৮

বনহুর মিঃ আরমানবেশী দূর থেকে এ দৃশ্য লক্ষ্য করলো। সে বুঝতে পারলো লণ্ডন পুলিশ বাহিনী জানতে পেরেছে আশার সঙ্গে দস্যু বনহুরের এখনও সংযোগ রয়েছে এবং সে কারণেই আশাকে এই মুহূর্তে ওরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো।

পুলিশবাহিনী আশাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই বনহুর নেমে এলো রাস্তায়।

রাস্তায় কয়েকটি গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়ানো ছিলো। একটা গাড়ির মধ্যে ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো, বনহুর ওকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে নেমে আসতে বললো।

ড্রাইভারটা কিছু বুঝতে না পেরে নেমে এলো গাড়ি থেকে।

অমনি বনহুর চেপে বসলো ড্রাইভিং আসনে।

ড্রাইভার কিছু বুঝবার পূর্বেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে মুহূর্তে জন সমুদ্রে মিশে গেলো।

ড্রাইভার চিৎকার করে গাড়ির পেছনে কিছুদুর দৌড়ে গেলো কিন্তু তখন গাড়িখানা উধাও হয়ে গেছে।

বনহুর পুলিশ ভ্যানকে ফলো করে গাড়ি চালিয়ে চললো।

মিস রীমা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে তার রাশিকৃত বিস্ময়। পুলিশবাহিনী হঠাৎ কি করে হসপিটালে এলো এবং এমনভাবে আশাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো।

মিস রীমা দৌড়ে গেলো ডাক্তারের ক্যাবিনে।

ডাক্তার তখন ব্যস্তভাবে কাজ করে চলেছেন। একটার পর একটা চোখ পরীক্ষা করে চলেছেন। তিনি।

মিস রীমা বলে উঠলো–ডাক্তার সাহেব, আশাকে পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে.....

মিস রীমার কথায় ডাক্তারের মুখে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না; তিনি চোখ তুলে একবার মাত্র দেখে নিলেন মিস রীমাকে।

অবাক হলো মিস রীমা, সে দৌড়ে গেলো পাশের ক্যাবিনে। সেখানে কয়েক জন ডাক্তার বসে কিছু আলাপ আলোচনা করছিলেন।

মিস রিমা এসে ব্যস্ততার সঙ্গে বললো–স্যার, রোগিণী আশাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

তারাও কোনো জবাব দিলেন না।

মিস রীমা বুঝতে পারলো এরা সবাই জানেন ব্যাপারটা, আর জানে বলেই সবাই তার কথায় আশ্চর্য হচ্ছেন না বা কোনো উত্তর দিচ্ছেন না।

ব্যর্থ মনে ফিরে এলো মিস রীমা।

বিষণ্ন মনে বসে পড়লো তার নিজের চেয়ারে। মিস জ্যাসিলিন নিহত হলো কিন্তু এরেষ্ট হলো আশা। তবে কি দস্যু বনহুর মানে মিঃ আরমান তাকে হত্যা করেছিলো? যে হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে আশা। কিন্তু এ কদিনের পরিচয়েই মিস রীমা দস্যু বনহুরকে জানতে এবং চিনতে পেরেছে। লোকে তাকে যাই বলুক বনহুর মিসেস জ্যামিলিনকে হত্যা করেনি বা করতে পারেনা। জ্যাসিলিন ছিলেন একজন সৎ-মহৎ মহিলা।

ডাক্তারগণ তাহলে পুলিশকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন আর সে কারণেই মিস রীমার কথায় তারা চুপ রইলেন।

মিস রীমার মনটা বড় অস্থির লাগছে।

সে নিজ ক্যাবিন ত্যাগ করে মিস আরমানের কক্ষের দিকে এগুলো।

ঐ মুহূর্তে একজন অপরিচিত লোক পথ রোধ করে দাঁড়ালো এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললো–মিঃ আরমানবেশী দস্যু বনহুর কক্ষে নেই।

কে আপনি? বললো মিস রীমা।

আমি কে পরে জানতে পারবেন মিস রীমা। আপনি যে দস্যু বনহুরকে সহায়তা করছেন এটা ধরা পড়ে গেছে আমাদের কাছে।

কি আপনার পরিচয় বলুন?

পরিচয় আজ বলবো না, একদিন জানতে পারবেন। কথাটা বলে লোকটা দ্রুত চলে গেলো।

লোকটা চলে যেতেই মিস রীমা তাকে অনুসরণ করে এগুলো। কিন্তু কোথায় লোকটা, যেন হাওয়ায় উবে গেছে। মিশে গেছে যেন দেয়ালের সঙ্গে।

মিস রীমা চলে গেলো সেখান থেকে।

কিন্তু লোকটার কথাগুলো ভাবছে কানের কাছে। কেমন সব এলোমেলো লাগছে।

এমন সময় ডাক্তার উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি মিস রীমাকে বললেন–মিস রীমা, আপনি জেনেশুনেও আশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছেন এটা বড় অন্যায়।

মিস রীমা উঠে দাঁড়িয়েছিলো, এবার সে বললো–আশার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা রোগিণীর সঙ্গে একজন নার্সের যতখানি তাই.....

না, আমরা লক্ষ্য করেছি আপনি প্রায় সব সময় আশার পাশে উপস্থিত থাকেন। আপনি জানেন সে কে এবং জেনেও আপনি তার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন।

মিস রীমা নিশ্চুপ থাকে।

ডাক্তার বেরিয়ে যান।

মিস রীমা ভাবে তার কি অপরাধ। আশা একজন রোগিণী আর সে কারণেই সে মিশেছে ওর সঙ্গে। দস্যু বনহুর তো কোনো অপরাধ করেনি যার জন্য সে তাকে ঘৃণা করবে...

মিস রীমা যখন ভাবছে বনহুরকে নিয়ে তখন বনহুর গাড়িখানা নিয়ে ফলো করে পুলিশবাহিনী আশাকে নিয়ে যে গাড়িতে এগিয়ে চলছে তার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

বনহুরের উদ্দেশ্য পুলিশ গাড়িখানা আশাকে নিয়ে কোথায় যায় তা লক্ষ্য করা। তারপর কেমন করে আশাকে উদ্ধার করতে হয় তা সে জানে।

ওদিকে যার গাড়ি নিয়ে বনহুর উধাও হলো তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতেই ড্রাইভার হন্তদন্ত হয়ে বললো–গাড়ি নিয়ে ভেগেছে স্যার।

কে–কে গাড়ি নিয়ে ভাগলো?

জানি না–একটা মানুষ।

মানুষ না তো গাধা গাড়ি নিয়ে ভাগবে? বলছি কে কোন্ দিকে ভেগেছে? বলো শিগগির বলো?

স্যার, একটা লোক এসে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলো, তারপর সে ড্রাইভিং আসনে বসে ঐ দিকে চলে গেলো।

আর তুমি চিৎকার করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

স্যার, আপনাকে ডাকার সাহস পাইনি....

কেন পাওনি?

স্যার, আপনি ড্যান্স দিচ্ছিলেন ম্যাডামের সঙ্গে, তাই।

এবার ভদ্রলোকটা পুনরায় হোটেলে ছুটে গেলেন এবং গাড়ি নম্বর জানিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

পুলিশ অফিস সন্ধান করবে বলে আশ্বাস দিলো। তারা যদি জানতো স্বয়ং দস্যু বনহুর এত নম্বর গাড়ি নিয়ে উধাও হয়েছে তাহলে পুলিশমহল ঝাঁপিয়ে পড়তে চারদিকে।

পুলিশমহল মনে করলো ভদ্রলোকের গাড়ি কোনো ভদ্রলোক নেশাযুক্ত অবস্থায় ভুল করে নিয়ে গেছে। পুলিশ অফিস ধীরে সুস্থে কাজ করবে।

ফিরে এলো বনহুর তার ক্যাবিনে।

প্রথমেই ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে দেখে নিলো নিজের চেহারাটা।

ঠিক মিঃ আরমান সে, একটুও তাতে ভুল নেই।

প্রবেশ করলো মিঃ আরমান যে কক্ষে আছেন সেই কক্ষে। বললো বনহুর– শুভেচ্ছা নিন।

মিঃ আরমান বালিশে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট পান করছিলেন। তিনি বনহুরকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে বসলেন। একটু হেসে বললেন–মিঃ আরমান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ; আপনি আমার বেশে সার্থক অভিনয় করে যাচ্ছেন।

সার্থক অভিনয় করলেও সফলকাম এখনইও হইনি।

সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

সিগারেট ধরাবার পূর্বেই বনহুর মিঃ আরমানের শয্যার পাশে বসে পড়েছিলো।

মিঃ আরমানের সঙ্গে বনহুরের বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। সে বুঝতে পেরেছে তাকে সার্থক করার পেছনে কারণ আছে এবং সে কারণ সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলেছে বনহুর। সব কথা খুলে না বললে হয়তো মিঃ আরমান তাকে ভুল বুঝতে; হয়তো বনহুরকে অসুবিধায় ফেলার জন্য চেষ্টা চালাতো।

বনহুর সিগারেট থেকে একরাশ ধোয়া নির্গত করে ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো–মিঃ আরমান, কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো কিন্তু আবার একটা নতুন অসুবিধা দেখা দিলো।

নতুন অসুবিধা আবার কি?

আর বলবেন না, যা ভাবিনি তাই হয়েছে। আশা আর মিস রীমার কথাবার্তা অথবা তাদের কোনো ভুলের জন্য পুলিশমহল জানতে পেরেছে দস্যু বনহুরের সঙ্গে এখনও আশার যোগাযোগ রয়েছে। তাই আশাকে গ্রেপ্তার করেছে লণ্ডন পুলিশ।

মিঃ আরমান বললেন–তাহলে তো নতুন আর একটা অসুবিধার সম্মুখীন হলেন আপনি?

হ বন্ধু, তাই

এমন সময় দরজার ধাক্কা পড়লো।

বনহুর কক্ষে প্রবশ করেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

এবার বনহুর সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে খুঁজে রেখে উঠে দাঁড়ালো, বললো–নিশ্চয়ই পুলিশমহল থেকে কেউ এসেছেন মিঃ আরমানের খোঁজে। যান এবার আসল মিঃ আরমান যান, কারণ এরা এখন অতি তীক্ষ্ণ নজরে পরীক্ষা করবেন।

মিঃ আরমান উঠে দাঁড়ালেন।

বনহুর বললো–এবার বন্ধুর কাজ শুরু হলো।

মিঃ আরমানের পিঠ চাপড়ে দিলো বনহুর।

মিঃ আরমান বনহুরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে। কক্ষের দরজা খুলে দিতেই দুজন পুলিশ সালাম জানালো, বললো–আপনি নিজ কক্ষে আছেন তাহলে স্যার?

বললেন মিঃ আরমান–হ, হসপিটাল থেকে সোজা হোটেলে চলে এসেছি। শরীরটা ভাল লাগছিলো না তাই।

পুলিশ দুজন পুনরায় সালাম জানিয়ে চলে গেলো।

মিঃ আরমান দরজা বন্ধ করে ফিরে এলেন বনহুর যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে। একমুখ হেসে বললেন–ওরা কোনোরকম সন্দেহ করেছিলো তাই সন্ধান নিতে এসে স্বচক্ষে দেখে গেলো আমাকে।

যে আপনি নিজের কামরাতেই আছেন। বললো বনহুর।

মিঃ আরমান বললেন–আপনার আচরণ এখনও আমাকে বিস্ময় মুক্ত করেনি।

কিন্তু সবই তো আপনাকে খুলে বলেছি মিঃ আরমান।

কিন্তু আপনার পরিচয়টা এখনও…

জানা হয়নি, এই তো?

হাঁ

একদিন জানতে পারবেন মিঃ আরমান এবং সেদিন আর বেশি দূরে নয়। মিঃ আরমান, আমার উদ্দেশ্য ছিলো মিসেস জ্যাসিলিনের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন করার পর লণ্ডন ত্যাগ করবো, কিন্তু…

বলুন থামলেন কেন?

আরও একটা নতুন রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি।

সে কেমন?

ঐ অন্ধ হসপিটাল।

তার মানে?

আমি জানতে পেরেছি ঐ অন্ধ হসপিটালের অন্তরালে এক গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

গভীর ষড়যন্ত্র।

হা মিঃ আরমান এবং ঐ কারণেই আপনাকে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে। আপনি আমার বন্ধু এবং চিরদিন আপনার উপকার আমার স্মরণ থাকবে। মিঃ আরমান, আজ থেকে আপনার ছুটি মানে মুক্তি।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন মিঃ আরমান ছদ্মবেশী আরমানের মুখের দিকে। আজ তার মুখমণ্ডলে একটা আনন্দদীপ্ত ভাব ফুটে উঠলো।

হেসে বললো বনহুর–বড় খুশি লাগছে আপনার আমি তা উপলব্ধি করেছি।

হাঁ, আমার বাইরে যাবার সুযোগ হলো জেনে খুশি লাগছে।

হলো নয় হয়েছে। এতদিন আপনাকে অনিচ্ছাকৃত আটক রাখার জন্য আমি দুঃখিত। হাঁ, আর একটা কথা বলে রাখি।

বলুন?

আজ থেকে আমি আপনার চাকর....

তার মানে?

মানে আপনি মনিব আর আমি চাকর। পুরোন ভূত। দেশ থেকে এসেছি...

এসব আপনি কি বলছেন?

হাঁ, যা হবে তাই বলছি।

আপনি অপেক্ষা করুন আমি আসছি। বনহুর বেরিয়ে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো।

মিঃ আরমান অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠলো–কে তুমি? আমার কক্ষে প্রবেশ করলে কি করে?

লোকটা নীরব।

মিঃ আরমান রাগত কণ্ঠে বললেন–ভদ্রলোক দরজা বন্ধ না করেই বাইরে গেছেন আর তুমি সেই ফাঁকে ঢুকে পড়েছে কামরায়, তাই না? বের হও, বের হও বলছি।

এবার কথা বললো বনহুর–আমাকে চিনতে পারছেন না স্যার, আমি আপনার পুরোন ভত্য হ্যারিসন।

ও এবার বুঝতে পারলাম.... আপনি.....আপনি...

আপনি নয় বলুন তুমি? আমি হ্যারিসন। পুরোনো নওকর।

উঃ কি সাংঘাতিক কাণ্ড বলুন তো?

আবার বলুন বলছেন?

তবে কি বলবো?

সব সময় তুমি বলবেন, নাহলে হঠাৎ কোনো সময় আপনি বেরিয়ে আসবে মুখ ফসকে।

আপনি–না তুমি–তুমিই বলবো।

এই তো বন্ধুর মত কথা। বললো বনহুর। একটু থেমে বললো আবার সে–মাঝে মাঝে আপনার গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে কাজ করবো, বুঝলেন?

আপনি দেখছি গাড়ি চালাতেও জানেন?

সব জানি মিঃ আরমান। আপনার চাকর হ্যারিসনের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

তাহলে তো বড় উপকার হয়। বেশ রাজি! বললেন মিঃ আরমান।

বনহুর বললো–আমাকে আপনি চিনতে পারেননি, কাজেই আমার ছদ্মবেশ সার্থক হয়েছে।

*

আশার তন্দ্রা ছুটে গেলো।

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর।

আশা আমি এসেছি…

তুমি!

মুহূর্ত বিলম্ব করোনা, উঠে এসো।

কোথায় যাবো?

পরে সব জানতে পারবে।

এই নাও আমার হাত ধরে বেরিয়ে এসো আশা।

আশা অন্ধকারে হাত বাড়াতেই একটা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ অনুভব করলো। আনন্দে বুকটা টিপ টিপ করে উঠলো তার। স্বপ্ন না সত্য–বনহুরের হাতখানা সত্যি তার হাতের মুঠোয়। আশা ভাবতেও পারেনি এই কারাকক্ষ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কঠিন পাথরে ঘেরা দেয়ালের মধ্যে আজ কদিন সে আবদ্ধ রয়েছে। মাঝে মাঝে তাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় বিচারকক্ষে, সেখানে বিচারকের সামনে তাকে নানা প্রশ্ন করা হয়, তারপর পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় সেই কারাকক্ষে।

বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য লণ্ডন পুলিশবাহিনী ব্যস্তসমস্ত। তাকে যেমন করে তোক খুঁজে বের করতেই হবে। গোয়েন্দা বিভাগ সমস্ত লণ্ডন নগরীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বনহুরকে পাকড়াও করতে না পারলে তাদের বিফলতার অন্ত

থাকবে না। কাজেই দস্যু বনহুরকে নিয়ে লন্ডন পুলিশবাহিনীর সর্বক্ষণ আলাপ আলোচনা চলেছে। ওয়্যারলেসে সর্বদা তাদের কথা বিনিময় হচ্ছে।

কালাই নগরী থেকে দস্যু বনহুর লণ্ডন নগরীতে আগমন করেছে, এটা বিস্ময়কর না হলেও ভয়ংকর। লণ্ডন সরকার চান না যে, দস্যু বনহুর তাদের দেশে বিচরণ করে বেড়াক, কোনো ক্ষতি সাধন করুক। এটা কোনো দেশেই চাইবে না যে তার দেশের বা জনগণের ক্ষতি সাধন হোক।

লণ্ডন সরকার চাইবে কেন।

এবং সে কারণেই সমস্ত–লণ্ডন নগরীতে পুলিশবাহিনী আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে, দস্যু বনহুর যেন কারও চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনো অঘটন ঘটাতে না পারে।

বনহুর আশাকে নিয়ে সাবধানে বেরিয়ে এলো কারাগার কক্ষ হতে। বনহুরের শরীরে জেল রক্ষকের ড্রেস তার হাতে রিভলভার।

আশাকে নিয়ে কারাগারের ফটকে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী ফটক খুলে দিলো এবং সেলুট করলো সসম্মানে।

বনহুর আশাসহ বেরিয়ে এলো ফটকের বাইরে।

একজন লোক দাঁড়িয়েছিলো জেলের অদূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো সে।

বনহুর আশাসই গাড়িতে উঠে বসলো।

লোকটি ড্রাইভার আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে গাড়িখানা চলে গেলো।

মাত্র কয়েক মিনিট, ভীষণভাবে বেজে উঠলো পাগলা ঘণ্টি। বিপদ সংকেত আলো জ্বলে উঠলো বার্লিহোম কারাগারের সুউচ্চ প্রাচীরের ফটকে।

পুলিশের ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে।

ওয়্যারলেসে সংবাদটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো ট্রাফিক পুলিশদের কাছে।

সবাই সজাগ হয়ে উঠলো।

দস্যু বনহুর বন্দিনী আশাকে নিয়ে পালিয়েছে।

গাড়ির নাম্বার জানে না কেউ।

তবে কোনো এক মোটরে গেছে, পুলিশবাহিনী তা জানে, তাই তারা পুলিশ ভ্যান নিয়ে ছুটলো এলোপাতাড়ি।

অনেক সন্ধান করেও কোনো হদিস পাচ্ছে না পুলিশবাহিনী।

লণ্ডন শহরের বিপদ সংকেত আলোগুলো জ্বলছে আর নিভছে।

ট্রাফিক পুলিশ হন্তদণ্ড হয়ে উঠেছে।

তারা যে গাড়ি যাচ্ছে থামিয়ে ফেলছে এবং তদন্ত করে দেখছে কোন গাড়িতে বনহুর বন্দিনীকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

বহু তদন্ত চালিয়েও পুলিশবাহিনী কিছুতেই বনহুর আর আশার সন্ধান পেলো না।

ততক্ষণে বনহুর আশাকে নিয়ে পৌঁছে গেছে তাদের হোটেলে।

সন্দেহের কোনো কারণ না থাকায় লণ্ডন পুলিশবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগ হোটেলে কোনো রকম পাহারা রাখেনি বা মোতায়েন করেনি।

বনহুর আশাসহ উঠে এলো উপরে।

ড্রাইভারও তাদের সঙ্গে আছেন যিনি এতক্ষণ কৌশলে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন।

হোটেল কক্ষের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেই বনহুর ড্রাইভারের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো–আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ আরমান। আপনি আমাকে সাহায্য না করলে এত সহজে কার্যোদ্ধার সম্ভব হতো না।

মিঃ আরমান ড্রাইভারের ড্রেস পরিবর্তনের জন্য ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করলেন।

বনহুর বললো–আশা, এ হোটেল কক্ষে কদিন তোমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। কারণ এখনও আমার কাজ শেষ হয়নি।

আশা অবুঝ নয়, সে জানে বনহুর একটা কথাও অনর্থক বলে না কাজেই সে নীরবে মাথা দোলালো।

বনহুর একটা সোফায় বসে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোয়া ছাড়লো।

আশা দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ।

বনহুর বললো–বসো আশা।

আশা আসন গ্রহণ করলো।

বললো বনহুর–বন্ধু মিঃ আরমান আমাকে সাহায্য না করলে এত সহজ হতো না বালিহোম কারাগারে প্রবেশ করা এবং কার্যোদ্ধার করা মোটেই সহজ হতো না। একটু থেমে বললো–আশা, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না?

কষ্ট তা হয়েছে বই কি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি তুমি কি করে প্রবেশে সক্ষম হলে এবং কি করে সেলের মোটা শিক বাঁকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে?

বনহুর হাতখানা মেলে ধরলো আশার সামনে।

বনহুরের হাত দুখানা লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো আশা। রক্ত জমে কালো হয়ে আছে হাতের আংগুল এবং তালুতে।

আশা কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারলো না, তাড়াতাড়ি বনহুরের হাত দুখানা মুঠায় চেপে ধরে নিজের নরম গালে স্পর্শ করলো।

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো বনহুরের হাতের উপরে। তারই জন্য বনহুরের হাত দুখানা কি ভাবে জখম হয়েছে।

এমন সময় মিঃ আরমান প্রবেশ করলো সেই স্থানে।

আশা সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ আরমান বললেন–মাফ করবেন আপনাদের স্বামী–স্ত্রীর কথাবার্তায় আমি ব্যাঘাত ঘটালাম।

না না, এমন কিছু নয়। বসুন মিঃ আরমান। বললো বনহুর। আশাকে লক্ষ্য করে বললো–যাও আশা, তুমি হাতমুখ ধুয়ে নিজকে সুস্থ করে নাও।

মিঃ আরমান বললেন, আপনার শরীর সুস্থ নয়, কাজেই আপনি যান, ঠাণ্ডা পানিতে হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

এতে বিপদ বাড়বে মিঃ আরমান, তার চেয়ে ক্ষুধা সহ্য করা অনেক শ্রেয়।

বললো আশা–আমার কোনো কষ্ট হবে না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বনহুর বললো–আশা, ওর পরিচয় তোমাকে দেওয়া হয়নি।

আমি ওকে চিনি না তবে নামটার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমার চোখ দুটি যখন অন্ধ ছিলো তখন ঐ নামটা আমি হসপিটালে বহুবার শুনেছি। মিঃ আরমান, আপনাকে আমি অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি কথাটা বলে আশা চলে গেলো বাথরুমের দিকে।

বনহুর যখন আশার হাতের মুঠা থেকে নিজের হাতখানাকে সরিয়ে নিচ্ছিলো তখন মিঃ আরমান লক্ষ্য করেছিলেন বনহুরের হাতখানা ভীষণভাবে জখম হয়েছে। মিঃ আরমান টেবিল থেকে পানির বোতলটা তুলে নিয়ে রুমালে ভিজিয়ে জলপট্টি করতে লাগলেন। মৃদু হাসলো বনহুর, কারণ এর চেয়ে অনেক বেশি আঘাত তাকে হজম করতে হয়েছে বহুবার।

মিঃ আরমান তাকে প্রথম শত্রু মনে করলেও আজ তাকে বন্ধুমনে করছেন, কারণ বনহুরের আচরণে অবাক হলেও তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেননি, কারণ আগন্তুক যেই হোক তার পরিচয় না জানালেও তার এমন কিছু কাজ তিনি লক্ষ্য করেছেন, যার জন্য তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন।

মাঝে মাঝে মিঃ আরমানের মনে সন্দেহ জাগে কিন্তু সে সন্দেহ গম্ভীর হলেও ক্ষণস্থায়ী, কারণ তিনি সব জেনে নিয়েছেন। মিসেস জ্যাসিলিনের মৃত্যুরহস্য

উদঘাটন করাই তার কাজ এবং এ কাজ সমাধা হলে সে বিদায় নিয়ে চলে যাবে।

মিঃ আরমান জানেন যেকোন ডিটেকটিভ কোনো রহস্যজাল উদঘাটন ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকেন এবং নানাভাবে তারা আত্মগোপন করে থাকেন বিভিন্ন জায়গায়।

তবুও যে মিঃ আরমানের মনে আরও একটা সন্দেহ উঁকি দেয়নি তা নয়। কিছুদিন পূর্বে লণ্ডন বিমান বন্দরে দস্যু বনহুর অবতরণ করে এবং তারপর সে নিখোঁজ হয়। পুলিশবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগ তাকে সন্ধান করে ফিরছে লণ্ডন নগরীর আনাচে কানাচেই শুধু নয়, সমস্ত নগরীর প্রায় স্থানেই তাদের আনাগোনা রয়েছে।

মিঃ আরমানের মনে প্রথম যে সন্দেহ দানা বেঁধে ছিলো তা জমাট বেঁধে উঠেছে এবং ওর কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু মিঃ আরমান তা বিশ্বাস করতে পারেনি প্রথমে, তবে আজ আর সন্দেহ শুধু সন্দেহেই সীমাবদ্ধ নেই, আগন্তুকটি কে হতে পারে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত তবুও মিঃ আরমান চান না ওকে পুলিশের হাতে অর্পণ করেন। কারণ ওর আচরণে বা কার্যকলাপে অন্যায় কিছু প্রকাশ পায়নি। তা ছাড়াও আরমান তাকে বন্ধু হিসেবেই মেনে নিয়েছেন।

যদি তিনি ওর মধ্যে কোনো খুঁত পেতেন তাহলে কিছুতেই হজম করে যেতে পারতেন না, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই সব কিছু প্রকাশ করে দিতে পারতেন। অবশ্য মিঃ আরমানের ক্ষমতা কিছুটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিলো তার ক্যাবিনের টেলিফোন বিচ্ছিন্ন করে। এ কারণেই প্রথমে মিঃ আরমান দুর্বল ছিলেন। তবে এখন মিঃ আরমান সম্পূর্ণ মুক্ত, ইচ্ছা করলেই বনহুরকে লণ্ডন পুলিশবাহিনীর হাতে তুলে দিতে পারেন তিনি।

আশা বাথরুমে।

বনহুর সিগারেট থেকে ধুম্র নির্গত করে চলেছে।

মিঃ আরমান কিছু ভাবছিলেন অপর এক সোফায় বসে।

বললো বনহুর–সব ভাবনার অবসান হবে মিঃ আরমান। আমার আসল পরিচয় আপনি পাবেন এবং তা অচিরেই পাবেন। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি আপনি কিছুটা আঁচ করে নিয়েছেন আমি কে?

মিঃ আরমান বললেন–আপনি জ্যোতিষীর মত কথা বলছেন। আমার মনের কথা আপনি সব জ্ঞাত আছেন দেখছি।

অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, জেনেও আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে সংবাদ দিচ্ছেন না, বরং

অথচ সাহায্য করে চলেছি, তাই না?

হ মিঃ আরমান, আপনার সাহায্য না পেলে আমাকে হয়তো ব্যর্থ হতে হতো।

বেশি বলবেন না, এতে আমার মনের পরিবর্তন আসতে পারে। কাজেই যাক ওসব কথা, এবার টেবিলে যে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে তাই তিনজন ভাগাভাগি করে নিয়ে খাওয়া যাক।

ততক্ষণে আশাও এসে গেছে।

আশাকে এখন অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে।

বললেন মিঃ আরমান–আসুন আমরা একসঙ্গে বসে খাবারগুলো খেয়ে নিই।

বনহুর আশার দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো–বসো।

আশা বললো–ধন্যবাদ, আমি রাতে কিছু খাবো না।

কেন? বললেন মিঃ আরমান।

আশা হেসে বললো–আনন্দে ক্ষুধা দূর হয়ে গেছে। সত্যি কি বলে যে আপনাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।

বনহুর বললো– হাঁ, মিঃ আরমান আমাদের বন্ধুই শুধু নন, পরম আপনজন। যা করছেন তা কল্পনাতীত।

বেশি বলে আমাকে ফাঁপিয়ে তুলছেন।

এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠলো।

মিঃ আরমান ও বনহুরের খাওয়া তখন সমাধা হয়েছে।

বললেন মিঃ আরমান–আপনারা দুজন ড্রেসিংরুমে চলে যান, নিশ্চয়ই পুলিশ এসেছে।

বনহুর এবং আশা দ্রুত ড্রেসিংরুমে চলে গেলো।

মিঃ আরমান বনহুরের খাবারের থালাটা সরিয়ে রাখলেন টেবিলের নিচে। তারপর দরজা খুলে দিলেন।

দরজা খুলে দিতেই মিঃ আরমান দেখতে পেলেন। দুজন পুলিশ অফিসার।

একজন মিঃ আরমানের অতি পরিচিত, তিনি মিঃ আরমানকে লক্ষ্য করে বললেন–মিঃ আরমান, আপনাদের অন্ধ হসপিটাল থেকে যে মহিলাটিকে আটক করা হয়েছিলো তাকে কারাগার থেকে দস্যু বনহুর নিয়ে ভেগেছে।

মিঃ আরমান বললেন–আমি কি করতে পারি?

যদি কোনো সন্ধান আপনার জানা থাকে বা ঐ ধরনের কেউ আপনার ক্যাবিনে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবেন। আমরা প্রত্যেকটা কামরায় এ কথা জানিয়ে গেলাম।

মিঃ আরমানের সঙ্গে পুলিশ অফিসারদ্বয় যখন কথা বলছিলেন তখন বনহুর সব শুনতে পাচ্ছিলো। সে মৃদু হাসলো তাদের কথা শুনে।

মিঃ আরমান বললেন পুলিশ অফিসারদ্বয়কে লক্ষ্য করে আপনারা কিছু ভাববেন না সে রকম কোনো কিছুর সন্ধান পেলে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে জানিয়ে দেব।

মিঃ আরমান দরজা বন্ধ করে ফিরে এলেন।

ডাকলেন তিনি–এবার বেরিয়ে আসুন।

বনহুর আর আশা বেরিয়ে এলো।

আবার জমে উঠলো নানা গল্প।

বনহুরকে আজ বড় প্রফুল্ল লাগছে।

আশার মনটাও প্রসন্ন কারণ বনহুরকে আনন্দিত দেখে তারও বড় আনন্দ হচ্ছে। বনহুর কেন এত খুশি হয়েছে আশার বুঝতে বাকি নেই। আশাকে বন্দী করার পর বনহুর বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলো। সর্বক্ষণ আশাকে মুক্ত করার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছিলো তাকে।

হঠাৎ এত অল্পসময়ে বনহুর আশাকে মুক্ত করে আনতে পারবে এটা তার নিজের কাছেও একটু আশ্চর্য লাগছে, কারণ লণ্ডন কারাকক্ষ থেকে বন্দীকে খালাস করে আনা সেটা কত ভয়ংকর তা সবাই জানে।

বনহুর জয়ী হয়েছে।

লোহার শিক বাঁকাতে গিয়ে হাতখানা তার ভীষণভাবে জখম হয়েছে। বলিষ্ঠ হাতের মুঠা লাল হয়ে কালো জখম হয়ে গেছে।

মিঃ আরমান পানিতে জলপট্টি করে হাত দুখানা সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুযোগ আসেনি।

আশাও লক্ষ্য করেছিলো মিঃ আরমান বনহুরের হাত দুখানা জলপট্টি করে আরোগ্য করে ভোলার জন্য সচেষ্ট। অত্যন্ত খুশি হয়েছে আশা, কারণ তার মনটা অস্থির হয়ে পড়েছিলো ওর হাত দুখানা দেখে।

মিঃ আরমান আর বনহুর যখন কথাবার্তা বলছিলো আশা বললো–আপনাদের কণ্ঠস্বর বাইরে শোনা যাবে, কাজেই এভাবে কথা না বলাই শ্রেয়।

মিঃ আরমান একটু হেসে বললেন–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ সব কামরার ভিতরের আওয়াজ কোনো ক্রমেই বাইরে যাবে না।

আশা কিছুটা আশ্বস্ত হলো এবার।

অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করায় আশা বারবার হাই তুলছিলো।

বনহুর বললো–যাও আশা ঘুমিয়ে পড়োগে।

মিঃ আরমান বললো–আপনাদের কষ্ট আমিই দিচ্ছি, আপনারা শয়ন করুন, আমি ড্রেসিংরুমে ঘুমোবো। কতদিন পর আপনাদের আজ শুভরাত্রি।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো আশার মুখমণ্ডল। সে বুঝতে পারলো মিঃ আরমান মনে করেছেন ওরা দুজন স্বামী স্ত্রী। কিছু বলতে যাচ্ছিলো আশা, বনহুর বুঝতে পেরে বলে উঠলো–মিঃ আরমান, আপনার কথা শিরোধার্য। আপনি এখানেই শয়ন করুন, আমরা বরং ড্রেসিংরুমে শয়ন করছি।

তা কি করে হয়, আপনারা আমার....

মেহমান, এই হত?

শুধু মেহমান নন, আপনারা বিপদগ্রস্ত মেহমান।

তাই আপনি জেনেও এবং বুঝেও আমাদের প্রতি এত সদয়? কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো.....

আপনাদের উপকার করতে পারলেই আমি ধন্য হবো মনে করছি।

সত্যি আপনার কাছে আমরা চিরঋণী। আমার আসল পরিচয় আজ না বলে পারছি না, যদিও আপনি কিছুটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। মিঃ আরমান, আমি সেই বনহুর যাকে লণ্ডন পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হেসে বললেন মিঃ আরমান–আপনি পরিচয় না জানালেও আমি জানতে পেরেছি কে আপনি। কারণ আপনার পৌরুষদীপ্ত চেহারা এবং আচরণ সবই বিস্ময়কর। আপনি সাধারণ মানুষ নন, এটা আপনাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। বললো বনহুর।

মিঃ আরমান বললেন–এবার শয্যা গ্রহণ করুন আপনারা।

তা হয় না, আপনি শয্যায় শয়ন করুন, আমরা ড্রেসিংরুমে... কথাটা বলে বনহুর আশার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর আশাকে নিয়ে গেলো এমন ভাব দেখিয়ে যেন ওরা দুজনা স্বামী স্ত্রী। মিঃ আরমান যেন কোন সন্দেহ করতে না পারেন। বনহুর এ ব্যাপারে বেশ সতর্ক রয়েছে।

ড্রেসিংরুমের মেঝেতে বিছানা পাতা, ছোষ্ট্র বিছানা, দুজন এক সঙ্গে শয়ন করা একটু। কষ্টকর।

বনহুর বললো–আশা, কিছু ভেবোনা, তুমি শুয়ে পড়ো।

আর তুমি?

আমি–তা আমার জন্য কোনো অসুবিধা হবে না। বনহুর একপাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লো।

আশা বিছানায় বসে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারলে তাকে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পড়তে দেখে ভীষণ দুঃক পাচ্ছে তাই একটু হেসে বললো–কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আশা, তুমি তো জানো সব সহ্য করার মতো এ দেহটা আমার।

জানি।

তবে শুয়ে পড়ো।

আশা এবার কোনো কথা না বলে শয্যায় দেহটা এলিয়ে দেয়।

লণ্ডন কারাকক্ষের মেঝেতে শুধু কম্বল বিছিয়ে কদিন কেটেছে আশার। নানা দুশ্চিন্তায় মনটা তার অস্থির ছিলো তাই সে ঘুমোতে পারেনি। আজ সে নিশ্চিন্ত, কারণ বনহুরকে পাশে পেয়েছে। বনহুরের কোনো অমঙ্গল হয়নি, এটাই তার বড় সান্তনা।

বনহুর দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাবছে কিভাবে এবার সে লণ্ডন ত্যাগ করবে। কাজ তার সমাধা হয়েছে, তবুও একটু বাকি আছে। জ্যাসিলিনের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু তাকে শায়েস্তা করা হয়নি এখনও, তাই কদিন তাকে আরও বেশি কাটাতে হচ্ছে লণ্ডনে। বনহুর যে ভরসা নিয়ে লণ্ডন এসেছিলো

তা সফল হয়েছে। আশার চোখ দুটোতে আবার সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। বড় আনন্দ লাগছে বনহুরের, কারণ আশা তার শুধু জীবন রক্ষাই করেনি, সে তাকে ভালবাসে গভীরভাবে। বনহুরের দুঃখ তার ভালবাসার বিনিময়ে তাকে সে কিছু দিতে পারেনি। মানুষের সমস্ত দেহের কোনো অঙ্গের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় তার চক্ষুদ্বয়। যার দৃষ্টিশক্তি নেই তার মত অসহায় বুঝি এ দুনিয়ায় কেউ নয়? আশা বড় নিঃসঙ্গ, বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো আশা ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা ফুটন্ত গোলাপ ধীরে ধীরে মান হয়ে আসছে সূর্যের প্রখরতায়। সূর্য শুধু তার তাপ দিয়ে পৃথিবীর কোমলতাকে কঠিন করে তোলে, কোমলতায় ভরিয়ে দিতে পারে না। পারে বসুন্ধরা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তুলতে.... আশা একদিন ফুটন্ত গোলাপের মত ছিলো–দিন দিন ঝিমিয়ে পড়ছে ক্লান্তি আর অবসাদে। আশা ভুল করেছে বনহুরকে ভালবেসে, সে ইচ্ছে করলে নিজের জীবনকে পরিপূর্ণতায় ভরিয়ে তুলতে পারতো। বিয়ে করে সংসারী হতে পারতো। স্বামী সংসার নিয়ে সুখে বসবাস করতে পারতো কিন্তু সে ভুল করেছে... বনহুকে ভালবেসে সে ভুল করেছে..... বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চোখ মুদলো। কিন্তু ভাবনা তাকে রেহাই দিলো না–কেন সে পারলো না আশাকে ভালবাসার বিনিময়ে কিছু দিতে। কেন সে তাকে গ্রহণ করতে পারলো না। আশা তো তাকে ভালবাসে অন্তর দিয়ে, আশা তো তাকে উজার করে দিতে চেয়েছিলো তার সবকিছু। নিজকে সে সমর্পণ করতে চেয়েছিলো বনহুরের কাছে

বনহুর আবার চোখ দুটো তুলে তাকালো আশার ঘুমন্ত মুখমণ্ডলের দিকে। সত্য কি সে তাকে গ্রহণ না করে ভুল করেছে? না ভুল সে করেনি, কারণ সে তো লোভ–লালসামুক্ত মানুষ। আশার ভালবাসা সে উপলব্ধি করে, তার বিনিময়ে সেও ভালবাসে ওকে–তাই বলে সে ওর পবিত্রতা বিনষ্ট করতে পারে না। চিন্তার গভীরে তলিয়ে যায় বনহুর।

তারপর দোয়ালে ঠেশ দিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো তার।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো আশা তার মাথার নিচে নিজের বালিশটা গুঁজে দিচ্ছে।

বনহুর বললো–বেশ ছিলাম।

কিন্তু আমি দেখলাম তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছো। শক্ত দেয়ালে মাথাটা তোমার অত্যন্ত আঘাত পাচ্ছিলো।

আমার মাথাটা মোটেই নরম নয় আশা, কাজেই ও কিছু হবে না।

তা হয় না, তুমি কষ্ট করবে আর আমি আরামে নিদ্রা যাবে। বনহুর, তুমি বিছানায় শয়ন করো আমি বসছি, কারণ আমার নিদ্রা শেষ হয়ে গেছে।

বনহুর হেসে বললো–আশা, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। তুমি ঘুমাও।

না, আমি কিছুতেই ঘুমাবো না। তুমি বিছানায় শয়ন করো।

বেশ, যদি তাতে খুশি হও।

শুধু খুশি নয়, স্বস্তি পাবে শান্তি পাবো।

আশা।

বলো?

তুমি সত্যি আমার জন্য কত ভাবো অথচ আমি তোমাকে কিছু–মানে কিছু ভালবাসাও দিতে পারিনি।

বনহুরের কথায় একটা স্নান হাসি ফুটে উঠলো আশার ঠোঁটের কোণে।

বনহুর শয্যায় শয়ন করে হাতখানা বাড়িয়ে দিলো আশার দিকে।

বনহুরের আহত হাতখানার উপরে আশা তার কোমল হাতখানা বুলিয়ে চললো।

বললো বনহুর–আশা, জীবনটাকে তুমি নিঃশেষ করে দিলে। সব আছে তোমার তবু তুমি নিঃস্ব রিক্ত। কেন তুমি নিজকে বঞ্চিত করলে আশা?

আশা বললো–আমি তোমার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে নিজকে পরিপূর্ণতায় ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম কিন্তু যখন জানলাম তোমাকে কোনোদিন পাবো না, তখন আমি তোমার প্রতিচ্ছবি মনের গভীরে প্রতিচ্ছত করে নিজকে পরিপূর্ণ করে তুলেছি। তুমি তো জানো বনহুর, আর আমার কোনো সাধ নেই। তোমাকে চিরকাল পূজা করবো হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে।

বনহুর একটু হেসে মুখটা বালিশের মধ্যে খুঁজে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলো।

*

জাভেদ লোহার দরজা খুলে টেনে বের করে আনলো নূরকে। তারপর তাকে সোজা অন্ধ গহ্বরে নিয়ে গেলো। হাত দুখানা শক্ত করে বেঁধে উপরে একটা রডের সঙ্গে আটকালো, তারপর একটা চাবুক তুলে নিলো সে হাতে।

নূরের কঠিন মুখোভাব।

সে মোটেই ভীত নয়।

জাভেদের দিকে সে বাঁকা চোখে তাকালো একবার।

জাভেদ বললো–বদমাইশ, তুমি জানো না তাই চালাকি করে আমাদের সর্দারকে আটক করে। রেখেছে। বলো তাকে কোথায় রেখেছো তোমরা?

নূর বললো–সর্দার! কে সর্দার?

নেকামি করছো! বলো সর্দারকে কোথায় আটক করে রেখেছো?

জানি না।

এবার জাভেদের হাতের চাবুকখানা সপাং করে পড়লো নূরে শরীরে।

নূর কুঁকড়ে গেলো না, যন্ত্রণায় মুখমণ্ডল তার শুধু বিকৃত হলো।

পুনরায় কষাঘাত করলো জাভেদ নূরের দেহে।

এমন সময় নূরী এসে জাপটে ধরলো–না না, ওকে তুই মারতে পারবি না। ওকে তুই মারতে পারবি না.....

সরে যাও আম্মু...

নূরীকে জাভেদ বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় আঘাত করলো নূরের দেহে। তারপর বেরিয়ে গেলো সে।

নূরী ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো নূরকে–বাপু, তুই কেন এলি এখানে?

নূর বললো—-আমি নিজে আসিনি, আমাকে ঐ দস্যু ধরে নিয়ে এসেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম আমি।

ও বুঝেছি। জাভেদ শুধু দুর্ধর্ষই হয়নি, সে কুচক্রী হয়েছে। যাও আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম....নূরী ওর দুহাতের বাধন খুলে দিলো। এসো আমার সঙ্গে।

নূরী হাত দুটি মুক্ত করে দিতেই নূর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললো–তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এর পূর্বেও তুমি যখন আমাকে মুক্ত করে দিয়েছিলে তখন তোমাকে আমার জন্য হয়তো অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। এবারও তুমি আমার জন্য....

সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। নূরী ওকে সঙ্গে করে একটা সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলো।

নূরী চলেছে।

পেছনে নূর।

আধো অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ।

অতি সন্তর্পণে চলতে হচ্ছিলো ওদের।

সুদীর্ঘ পথ মনে হলো নূরের কাছে। সুড়ঙ্গটা ক্রমান্বয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে এগুচ্ছে।

অনেকক্ষণ চলার পর এমন স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানে কোনো পথ নেই।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললো–পথ পাথরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে কি জাভেদ টের পেয়েছে…

নূর বুঝতে পারলো জাভেদ বুঝতে পেরে পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

হাত দিয়ে নুরী পাথরটা সরিয়ে দেবার চেস্টা করলো কিন্তু কিছুতেই সরাতে সক্ষম হলো না।

এবার নূর এসে পাথরখণ্ডটাকে সরিয়ে ফেলার জন্য ভীষণভাবে শক্তি প্রয়োগ করলো। নূরের দেহেও কম শক্তি ছিলো না, সে ঠেলে পাথরটাকে উল্টে ফেলে দিলো।

তারপর ওরা বেরিয়ে এলো দুজন।

নূরী আর নূর।

নূরী বললো–যাও, তুমি মুক্ত…..

কথা শেষ হয় না নূরীর, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে জাভেদ–হাঃ হাঃ হাঃ আমি জানতাম এবারও তুমি ওকে মুক্ত করে দেবে, তাই সজাগ ছিলাম……

নুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো–তোমার ক্ষমতা নেই আমার পথ রোধ কর।

কি বললে ডিটেকটিভ চক্রী।

সরে যাও পথ ছেড়ে…. নূরী গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বললো।

নূরীর চোখে শুধু বিস্ময় নয়, ভীতিভাব ফুটে উঠলো। না জানি এই মুহূর্তে কি অঘটন ঘটবে। নুরী চেয়েছিলো নূরকে মুক্ত করে দেবার পর যা তার ভাগ্যে ঘটে ঘটবে। নিজের জীবন দিয়েও সে রাজি আছে তবু নূরের যেন অমঙ্গল না হয়।

কিন্তু একি হলো।

নূরের চিন্তা বিছিন্ন হয়ে গেলো, নূরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো জাভেদ।

শুরু হলো উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ।

জাভেদ নূরের প্রতি অস্ত্র ব্যবহার করলো না। কারণ নূর অস্ত্রশূন্য ছিলো।

জাভেদ আর নূরে ভীষণ লড়াই চলেছে।

নূরী বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে।

সে কোনো রকমে বাধা দিতে পারছে না।

নূরী জানে নূর আর জাভেদের সম্পর্ক তবুও সে বলতে পারে না কিছু। বলা তার মোটেই শ্রেয় হবে না।

দুটি সিংহশাবক লড়াই করছে যেন।

হঠাৎ জাভেদ নূরকে মাটিতে ফেলে একটা পাথরখণ্ড তুলে নিয়ে নূরের মাথায় আঘাত করতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে নূরী এসে চেপে ধরলো জাভেদের পাথরসহ হাত দুখানা। চিৎকার করে বললো–ওকে হত্যা করিস না, আমি তোকে বারণ করছি জাভেদ।

তুমি সরে যাও, আমি ওকে খতম করে তবে ফিরে যাবো।

নূরী বলে উঠলো–জাভেদ!

না, কোনো বাধাই আমি শুনবো না।

আমি তোর কাছে হাতজোড় করে বলছি ওকে তুই মাফ করে দে। নূরী কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাটা বললো।

নূর বলে উঠলোনা, আমি কোনো অপরাধী নই, কাজেই আমি মাফ চাই না। তুমি আমার মায়ের মত, তাই তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই বলে আমি কারও কাছে তোমাকে মাফ চাইতে দেবো না।

নূর!

হাঁ, মনে রেখো আমি কোনো দোষ করিনি।

তুমি দোষ করোনি ডিটেকটিভ? তবে সর্দারকে কারা আটক করেছে কে তাকে বন্দী করে। সরিয়ে ফেলেছে।

নূরী বলে উঠলো–না, ও সর্দারকে আটক করেনি।

আম্মু, তুমি মিথ্যা বলছো?

না, আমি জানি ওর কোনো দোষ নেই।

আমি জানি ঐ বাদমাইশটা সর্দারকে আটক করে রেখেছে।

জাভেদ, কারও সাধ্য নেই সর্দারকে আটক করে রাখে। আমার মন বলছে তাকে কেউ আটক করেনি।

নূর বুঝতে পারলো সর্দার মানে তার আব্বু। একটা মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এদের সর্দার হারিয়ে গেছে, তাকে এরা খুঁজে পাচ্ছে না, তাই এত আক্রোশ তার উপর। তবে কি এই তরুণ আব্বুর কোনো অনুচর–কিন্তু মেয়েটি কে?

নূরী এসে জাভেদের হাত দুখানা চেপে ধরলো–জাভেদ, আমি জানি সর্দারকে ও আটক। করেনি....

নূর তখন হাতের পিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছে ফেলছিলো।

জাভেদ গর্জন করে বললো–সর্দার যতদিন ফিরে না আসবে ততদিন ওকে বন্দী করে রাখবো....

বলে উঠলো নুর–তোমার সাধ্য নেই আমাকে বন্দী করে রাখা....

আবার ছুটে এসে জাভেদ নূরের জামার কলার চেপে ধরলো।

নূরী পারলো না তাদের লড়াই ক্ষান্ত করতে।

আবার শুরু হলো যুদ্ধ।

উভয়ে লড়াই করতে করতে উঠে গেলো পাহাড়টার উপরে।

ওপাশে খরধার নদী।

প্রবল স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছে ভীষণ বেগে।

নূরী ছুটলো রহমানের সন্ধানে, কারণ সে পারলো না ওদের যুদ্ধ থামাতে। সুড়ঙ্গপথে নূরী ঘুরতে লাগলো রহমান এসে যদি বন্ধ করতে পারে ওদের লড়াই তবু রক্ষা পাবে।

ওদিকে নূর আর জাভেদ এ ওকে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। পেছনে নদীর স্রোতের কল কল শব্দ কানে আসছে। প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে।

লড়াই এবার পাহাড়ের উপর চলেছে।

একজন আর একজনকে কাবু করার ভীষণ চেষ্টা। উভয়ের শরীরের স্থানে স্থানে কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ছে কপালের চারপাশে।

এবার প্রচণ্ড এক ধাক্কায় নূরকে জাভেদ ফেলে দেয় নিচে একেবারে নদীবক্ষে।

জাভেদ ওকে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

পাথরে মাথা ঠুকে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে জাভেদের মাথাটা। কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।

জাভেদ তাকিয়ে দেখলো নদীবক্ষে নূর তলিয়ে গেলো।

এমন সময় রহমান আর নূরী এসে দাঁড়ালো সেখানে। পেছন থেকে তারা জাভেদকে ঝুঁকে নদীবক্ষে লক্ষ্য করতে দেখে বুঝতে পারলো নূরকে নদীবক্ষে সে নিক্ষেপ করেছে।

রহমান আর নূরী মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিয়ে নূরী বললো–সর্বনাশ হয়ে গেছে, নূরকে জাভেদ নদীবক্ষে ফেলে দিয়েছে। ছুটে যাচ্ছিলো নূরী জাভেদকে সে

কিছু কঠিন কথা বলবে কিন্তু রহমান বাধা দিয়ে বললো–থাক কিছু বলনা নূরী, যা হবার হয়ে গেছে আমি দেখছি।

রহমান দৌড়ে নেমে গেলো পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা নিচে। ঐ স্থান থেকে নূর যেখানে পড়ে গেছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রহমান নদীবক্ষে। যদিও রহমানের একটা হাত নেই তবু সে সাঁতারে কম নয়, দক্ষ সাতারুর মত সাঁতার কেটে এগুলো।

অবশ্য নূরও সাঁতার জানে, সেও একজন দক্ষ সাতারুর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

তবে আজ সে আহত, তাই নিজকে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মুখে ধরে রাখতে পারছিলো না। নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেছে সে।

রহমান সাঁতার কেটে ঐ স্থানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ঢেউ প্রচণ্ডভাবে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলো, তবুও রহমান প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে যেমন করে থোক নূরকে রক্ষা করতেই হবে।

ওদিকে নূরীর বুকটা ধক ধক্ করছে। সে বারবার আল্লাহর নাম স্মরণ করছে।

নূরকে এখনও কিছু কিছু নজরে আসছে।

সেও সাঁতার কেটে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

জাভেদ ওকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে ফিরে চললো জয়ী সৈনিকের মত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

*

রহমান যখন নূরকে ধরে ফেললো তখন নূর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। রহমান একটা হাত দিয়ে ওকে ধরে রাখবে না সাঁতার কাটবে ভেবে পেলো না। সে প্রথম একটু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, দাঁত দিয়ে সে নূরের জামা ধরলো তারপর সে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগুতে লাগলো।

নূরী পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এলো নদীর ধারে এবং উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার মনে ভীষণ একটা ঝড় সৃষ্টি হয়েছে, সে ভাবতে পারছে না নূরের এমন একটা বিপদ ঘটবে।

কিছুটা নিকটে আসতেই প্রচণ্ড ঢেউগুলো পুনরায় নূরসহ রহমানকে ঠেলে নিয়ে গেলো দূরে।

নূরী বিলম্ব না করে একটা বড় শুকনো কাঠ টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কারণ সেও সাঁতার জানতো ভালভাবে।

এবার নূরী সাঁতার কেটে এগুতে লাগলো যদিও প্রচণ্ড ঢেউগুলো তাকে সাঁতার কাটায় বাধার সৃষ্টি করছিলো তবু নুরী আপ্রাণ চেষ্টায় সে বাধা অতিক্রম করে পৌঁছে গেলো রহমান ও নূরের কাছে।

সে রহমানকে সাহায্য করলো।

কাঠের খণ্ডটা রহমানের হাতের নিচে ঠেলে ধরলো।

রহমান নূরের জামাটা ধরে ছিলো দাঁত দিয়ে কামড়ে। এবার হাতখানা দিয়ে ধরে ফেললো কাঠের খণ্ডটা।

রহমান এবার নূরসহ তীরের দিকে এগুলো।

নূরীও তীরে পৌঁছে গেলো।

উভয়ে মিলে নূরকে তুলে আনলো তীরে।

নূরের সংজ্ঞাহীন দেহটা তীরের মাটিতে শুইয়ে দিয়ে নূরী আর রহমান তার সংজ্ঞা ফিরে আনার চেষ্টা করতে লাগলো।

রৌদ্রতাপে শুকিয়ে এলো ওদের দেহ এবং জামাকাপড়।

নূর ধীরে ধীরে চোখ মেললো এক সময়।

রহমান এবার নূরকে লক্ষ্য করে বললো–কোনো ভয় নেই ছোট সাহেব, আমি।

তুমি! অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো নূর।

রহমানকে দেখে বিস্মিত হলো। রহমানকে সে ছোটবেলায় বহুবার দেখেছে আজও তার সেই চেহারা মোটেই বিস্মিত হয়নি বেশ স্পষ্ট মনে আছে তাকে।

একটা হাত না থাকায় রহমান অসুবিধা বোধ করছিলো তবু নূরের মাথাটা সে তুলে নিলো কোলে। তারপর সেই সহকারে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

নূরী পাশে বসেছিলো।

নূর একবার তাকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর চোখ বন্ধ করলো।

রহমান নূরীকে বললো, কিছু শুকনো কাঠ আর পাতা নিয়ে এসো, আগুন জ্বালাতে হবে।

নূরী তাই করলো।

রৌদ্র তাপ হলেও ঠাণ্ডায় নূরের হাত-পা বরফের মত জমে এসেছিলো।

রহমান নূরের মাথাটা কোল থেকে অতি যত্নসহকারে নামিয়ে রাখলো, তারপর পাথর ঠুকে আগুন জ্বালালো।

শুকনো পাতা আর কাঠে আগুন ধরে গেলো। নূরী আগুনে নিজের ওড়নার আঁচল গরম করে নূরের হাতে পায়ে সেঁক দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নূর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

সে রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–রহমান চাচা তুমি?

হাঁ, হাঁ নূর, আমি তোমার রহমান চাচা।

বহুদিন তোমার কথা আমার স্মরণ হয়েছে। কিন্তু তোমাকে আর খুঁজে পাইনি। তোমার একখানা হাত কোথায়?

হারিয়েছি। একটা দুর্ঘটনায় হাতখানা আমার নষ্ট হয়ে যায়, আমি ওটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। করে ফেলেছি।

বড় দুঃখ হচ্ছে তোমাকে দেখে।

সব আমার অদৃষ্ট, বুঝলে বাবা!

তা তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে আর আমাকে এই মৃত্যুর কবল থেকে তুমি রক্ষা করলেই বা কেন?

রহমান একটু হেসে বললো–নূর, তুমি আরও কয়েকবার আমাকে দেখেছো কিন্তু পরিস্থিতিক্রমে তুমি হয়তো আমাকে চিনতে পারেনি। যাক তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আমি একজন দস্যু.... কিন্তু দস্যু হলেও আমি মানুষ এবং সে কারণেই আমি তোমাকে খরস্রোতা নদীবক্ষ হতে রক্ষা করেছি। তারপর আরও বলবো, দস্যু বলেই আমি বনে জঙ্গলে বাস করি এবং তোমাকে মানবতার খাতিরে ও স্নেহের টানে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আসলে তো রক্ষাকারী তিনি। রহমান আংগুল দিয়ে উপরের দিকে দেখালো।

নূর তাকালো নূরীর দিকে।

রহমান বুঝতে পারলো নূরীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। তাই জানতে চাচ্ছে নূর। তাই সে বললো.... ও আমার বোন। ও তোমাকে স্নেহ করে... যাক ওসব কথা, এবার তোমাকে কান্দাই শহরে তোমার বাসভবনে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

নূর উঠে দাঁড়াতে গেলো।

রহমান বললো–বিলম্ব করতে হবে, না হলে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আর আমি অসুস্থ হবো না রহমান চাচা।

নূর

তোমার স্মরণ আছে আমার নাম রহমান চাচা!

হা স্মরণ আছে। তুমি আমাকে কত ভালবাসতে আদর করে কত কি খেতে দিতে, সব মনে আছে আমার।

নূর, এই যে আমার বোনকে দেখছো সেও তোমার একজন পরম, হিতাকাঙ্ক্ষী……

আমি জানি ও আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। আমাকে সে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছে নিজের জীবন বিপন্ন করে। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

নূরীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো।

নূরকে সে কোলে কাখে করে মানুষ করেছিলো শিশু কালে। নিজের ছেলের চেয়েও কোনো অংশে কম ছিলোনা নূর তার কাছে। নূরীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো বনহুর যখন নূরকে তার মায়ের কোল থেকে হরণ করে তার কোলে অর্পিত করেছিল। ছোট্ট ছিলো তখন নূর নাম রেখে ছিলো তার মনি। ওর সেই কচি মুখখানা আজও ভোলেনি নূরী। তার হুরের মত ওরও দক্ষিণ বাহুতে ছিলো একটি কালো জট। নূরীর বড় দেখতে ইচ্ছা করলো ওর দক্ষিণ বাহুখানা।

নূরী এগিয়ে গেলো তারপর ওর বাহুর জামাটা তুলে ধরে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

অবাক হলো নূর ওর আচরণে তবু নিশ্চুপ রইলো না অবাক হয়ে শুধু লক্ষ্য করতে লাগলো।

নূরী একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো অতি সাবধানে।

নুর বুঝতে পারলো তার দক্ষিণ হাতের জটটি লক্ষ্য করে কিছু ভাবছে সে।

রহমান নূরীর দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললো–চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কোথায়?

তোমার বাসায়।

চল, কিন্তু…..

কিন্তু কি?

ও… নূরীর দিকে তাকিয়ে বললো নূর।

রহমান বুঝতে পারলো নূরীকে ছেড়ে চলে যেতে দুঃখ হচ্ছে খুব। বললো রহমান–ও ফিরে যাবে তার নিজের বাসায়।

নূরী এগিয়ে এলো, বললো সে বাবু তুমি আর এসোনা। এখানে অনেক বিপদ আছে…

নূরীর কথায় নূর কোনো জবাব দিলো না। সে শুধু নীরবে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলো।

হাত নাড়ালো নূরী।

চোখ দুটো তার ছল ছল হয়ে এসেছিলো।

এখানে যখন নূর রহমানসহ কান্দাইয়ের পথে রওয়ানা দিলো তখন জাভেদ ফিরে এসেছে আস্তানায়। ক্রুদ্ধ সিংহের মত তাকে ভীষণ মনে হচ্ছিলো।

সে একটি গাছের ছায়ায় বসলো।

যত রাগ তার মায়ের উপর। কারণ তরুণ ডিটেকটিভটাকে সে সায়েস্তা করতে চেয়েছিলো, সব বানচাল হয়ে গেলো।

নূরী যে বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছে তা ভালভাবে জানে এবং নিজের চক্ষে সে তাকে দেখেছে, কাজেই মায়ের উপর রাগ হওয়াটা তার স্বাভাবিক।

জাভেদ যখন একটি গাছের তলে বসে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলো তখন ফুল্লরা পেছন থেকে এসে একটা লম্বা কাঠি নিয়ে ওর মাথার চুলে নাড়া দিলো।

চমকে ফিরে তাকালো জাভেদ।

ফুল্লরা উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়লো।

জাভেদ রাগতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালো।

ফুল্লরা এবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ পুনরায় দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরালো, ফুল্লরার প্রতি তার রাগ এ কারণে, কেন সে তাকে এ ভাবে বিরক্ত করে। কেন তার কাছাকাছি আসে ফুল্লরা, জাভেদ আপনাতে আপনি বিভোর থাকতে চায়।

আর ফুল্লরা সে চায় জাভেদকে আপন করে নিতে। জাভেদ তার হৃদয় জুড়ে স্থান করে নিয়েছে, জাভেদের হাসি তার কণ্ঠস্বর, তার চলাফেরা সব তাকে আকৃষ্ট করেছে। এ ছাড়াও ফুল্লরা ছোটবেলা হতেই দেখে আসছে জাভেদকে। ও যে ওর খেলার সাথী.....

ফুল্লরা ওকে যত ভালবেসেছে, জাভেদ ওকে তত দূরে ঠেলে দিয়েছে। ফুল্লরা যেন ওর চোখের বালি। ওকে দেখলেই জাভেদের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে ওঠে।

তেমনি ফুল্লরাও নাছোড়বান্দা।

প্রথম প্রথম ও যে অভিমান করতো, ব্যথায় মুষড়ে পড়তো কিন্তু এখন সে শক্ত করে নিয়েছে মনটাকে। একটুতেই ঘাবড়ে যায় না বা রাগ করে না।

জাভেদ আজ যখন ফুল্লরাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে। আঁচলে কিছু বন ফুল সে এনেছিলো সেই ফুল সে ছড়িয়ে দিলো জাভেদের মাথার উপরে।

এতে জাভেদ আরও রেগে গেলো, কিন্তু কোনো কথা না বলে সে একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টি মেলে তাকালো ফুল্লরার দিকে।

ফুল্লরা হেসে বললো–জাভেদ ফল খাবে?

আঁচল থেকে একটা সুমিষ্ট পাকা ফল বের করে দেখালো সে জাভেদকে।

জাভেদ তাকালো কিন্তু কোনো উত্তর সে দিলো না।

ফুল্লরা মনে করলো ফলটা হয়তো সে নেবে। কিন্তু কোন লক্ষণ নেই ফল নেবার।

ফুল্লরা ফলটা হাতে নিয়ে ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ফলটা তুলে ধরলো ওর মুখের কাছে।

জাভেদ ফলটা নিয়ে ফেলে দিলো।

ফুল্লরার দুচোখ ছাপিয়ে পানি এলো, সে অধর দংশন করতে লাগলো।

জাভেদ চলে যাচ্ছিলো।

ফুল্লরা ওর পথ আগলে দাঁড়ালো। বললো সে যেতে পারবে না।

জাভেদ দুচোখে বিস্ময় এনে বললো–কেন?

তুমি জবাব দাও কেন আমার দেওয়া ফলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে?

আমার হাত পা আছে, গাছ থেকে পেড়ে খাবো। তোমার দেওয়া ফল আমি খেতে যাবো কেন। সরে দাঁড়াও, আমাকে যেতে দাও।

না, তোমাকে যেতে দেবো না! আচ্ছা জাভেদ, তোমার মন বলে কি কিছু নেই।

হঠাৎ জাভেদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

ঠিক যেমনি করে বনহুর হাসে।

ফুল্লরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে সর্দারকে ঐ ভাবে হাসতে দেখেছে। বড় অদ্ভুত সে হাসি, এমন করে বুঝি কেউ হাসতে পারে না।

জাভেদের হাসি যেন থামতে চায় না।

জাভেদ হাসছে।

ফুল্লরা বললো–আমার কথায় তুমি হাসছো। বেশ, আমিও আর আসবো না তোমার কাছে। এলে আমার বয়েই যাবে।

জাভেদ তখন গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

সে একবার ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করলো।

ফুল্লরা ভাবতে লাগলো ওকে কেমন করে জব্দ করবে। কেমন করে ওকে আকৃষ্ট করবে। জাভেদকে ফুল্লরা ছোটবেলা হতে দেখে আসছে, ওর মধ্যে প্রেম–ভালবাসার কোনো চিহ্ন নেই। কাজেই ফুল্লরার রূপ–যৌবন তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। এটা সে জানে, তাই নতুন কোনো একটা ফন্দি ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় এলো।

জাভেদের অশ্বটাকে লুকিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই সে খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে তখন এসে বলবে তার ঘোড়াটা কোথায় আছে সে জানে। নিশ্চয়ই ফুল্লরাকে তখন তোষামোদ করবে আকুতি মিনতি করে। মজাটা হবে তখন....

ফুল্লরা সোজা চলে গেলো অশ্বশালায়।

একটা একটা করে সে অশ্বগুলো লক্ষ্য করলো, পাশে শক্ত করে বাঁধা আছে জাভেদের অশ্বটা।

ফুল্লরা ওর চেহারা দেখে খুশি ছিলো না কোনোদিন, কারণ জাভেদের অশ্বটার দেহ এবং চোখমুখ ছিলো অতি ভয়ংকর। যেমন ভয়ংকর তেমনি দুর্দান্ত।

তবু ফুল্লরা সাহস করে এগিয়ে গেলো।

ভীতভাবে অশ্বের মুখের দিকে তাকালো ফুল্লরা বারবার, তারপর লাগাম খুলে নিলো।

জাভেদের অশ্বটা যে পাশে বাধা ছিলো সেই পাশে ছিলো উঁচু একটা পাথরখণ্ড। ফুল্লর সেই পাথর খণ্ডটার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর জাভেদের অশ্বের লাগাম হাতের মুঠায় চেপে ধরে অশ্বপৃষ্ঠে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্বটা দ্রুত বেরিয়ে এলো অশ্বশালা থেকে।

ফুল্লরা তাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারলো না। অশ্বটা ভীষণভাবে ছুটতে শুরু করলো। বনজঙ্গল ভেদ করে ছুটলো।

জাভেদ সেই পথ ধরে ফিরছিলো।

তার পাশ কেটে ঝড়ের মত চলে গেলো তারই অশ্ব এবং অশ্বপৃষ্ঠে ফুল্লরা। সে এলোমেলোভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় অশ্বের লাগাম ধরে বসে আছে।

জাভেদ অবস্থাটা অনুধাবন করলো এবং ফুল্লরার বিপদাপন্ন পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সে ছুটলো আস্তানা অভিমুখে। এত দ্রুত সে ছুটলো যে অল্প সময়েই পৌঁছে গেলো আস্তানায়।

অশ্বশালায় প্রবেশ করে তাজের লাগাম খুলে নিলো। চেপে বসলো ওর পিঠে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটলো জাভেদ তার নিজের অশ্ব পৃষ্ঠে ফুল্লরা যে পথে চলে গেছে সেই পথে। তাজ উল্কাবেগে ছুটলো বনজঙ্গল পেরিয়ে। তাজের খুরের প্রতিধ্বনি কান্দাই জঙ্গলের জীবজন্তুকে আতঙ্কিত করে তোলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জাভেদের কানে ফুল্লরার অপদশব্দ ভেসে এলো।

এবার জাভেদ সেইদিকে ছুটলো।

তার অশ্ব জাম্বি কত দুর্দান্ত এটা জানে জাভেদ। সাধ্য নেই কেউ ওকে আয়ত্তে আনে একমাত্র জাভেদ ছাড়া। না জানি ফুল্লরাকে সে এতক্ষণে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে পায়ে পিষে ফেলেছে কিনা।

জাভেদ ছুটছে তো ছুটছেই।

তাজের খুরের আওয়াজ পাথুরিয়া মাটিতে ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বন-জঙ্গলে পশু-পাখি সে আওয়াজে প্রকম্পিত হলো। গাছের পাতাগুলো যেন কাঁপছে থরথর

বনবাদাড় জলা পাথরখণ্ড ডিংগিয়ে ছুটছে। এক একটা টিলার উপর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে তাজ।

তাজ বুঝতে পেরেছে জাম্বিকে ধরতে হবে, তাকে পরাজিত করতে হবে, তাই তাজ প্রাণপণে ছুটছে। জাভেদ তাজের পিঠে বসে লাগাম চেছে ধরে আছে। সে এক ভীষণ দৃশ্য যেন।

জাভেদ একসময় দেখতে পেলো দূরে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে জাম্বি আর ফুল্লরার দেহ অর্ধ ঝুলন্ত অবস্থায় জাম্বির পিঠে।

জাভেদ তাজকে এমনভাবে অন্য পথে চালনা করলো যে জাম্বিকে সে পাকড়াও করতে পারে। সোজা পথে নয়, এলোপাতাড়ি পথে তাজ জাম্বির পাশাপাশি এসে পড়লো।

ঐ মুহূর্তে জাম্বির পৃষ্ঠদেশ হতে তুলে নিলো জাভেদ ফুল্লরাকে এবং তাজসহ দাঁড়িয়ে পড়লো কিছুদূর গিয়ে.....।

জম্বিও ততক্ষণে বেশ কিছুটা দৌড়ে গিয়ে থামকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জাভেদ ফুল্লরাসহ নেমে পড়লো তাজের পিঠ থেকে। ফুল্লরা ভাবতেও পারেনি জাভেদ তাকে এভাবে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে।

ক্ষণিকের জন্য হলেও ফুল্লরা জাভেদের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরলো এবং তার দেহের পরশ তাকে অভিভূত করলো। ফুল্লরা যেন আত্মহারা হয়ে পড়লো।

জাভেদ এবার ফুরাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো জাম্বির দিকে।

জাম্বি তখনও পাগলামি করছিলো।

জাভেদ ওকে ধরে ফেললো তারপর টেনে আনলো ফুল্লার পাশে। ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো জাভেদ–এমন কাজ কেন করতে গিয়েছিলে? জাম্বিকে তুমি চেনো না সে কত ভয়ংকর।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিলো না।

সে একবার দৃষ্টি তুলে ধরলো জাভেদের মুখের দিকে, তারপর চোখ দুটো নত করে নিলো।

জাভেদ এবার ফুল্লরাকে তাজের পিঠে তুলে দিলো, তারপর নিজে চেপে বসলো জাম্বির পিঠে। তার হাতের মুঠায় তাজের লাগাম।

ফুল্লরার অশ্বের লাগাম ধরে নিয়ে চললো জাভেদ। অপূর্ব এক অনুভূতিতে ফুল্লরার মনটা নেচে উঠলো। কিছুক্ষণ পূর্বেও ফুল্লরা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত ছিলো আর এখন সে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। ফুল্লরার জীবন আজ ধন্য সত্যি জাভেদ তাকে ভালোবাসে। সে না বুঝে ভুল করেছে... নানা ধরনের চিন্তা ফুরাকে উচ্ছল করে তুললো। কতক্ষণ লাগলো খেয়াল নেই হঠাৎ ফুল্লরার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

আস্তানার কাছাকাছি এসে গেছে তারা।

ফুল্লরাকে নামিয়ে নিলো জাভেদ।

বললো ফুল্লরা– জাভেদ! জাভেদ তুমি কত ভাল!

জাভেদ ফুল্লরার দিকে একবার তাকিয়ে জাম্বির পিঠে উঠে বসলো। তারপর অশ্ব নিয়ে ছুটে চলে গেলো সেখান থেকে।

ফুল্লরা এতক্ষণ উচ্ছল আনন্দে গদগদ হয়ে পড়েছিলো। এবার সে ম্লান হয়ে গেলো। কই, জাভেদ তো একটিবার তার সঙ্গে তেমন করে কথা বললো না। তার ভাবধারায় তো একটুও পরিলক্ষিত হলো না সে তাকে ভালবাসে, তবে কি জাভেদ তাকে অনুগ্রহ করে....

ফুল্লরার বুক চিরে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস।

*

নূর, এ তোর কি অবস্থা হয়েছে? নূরের দিকে তাকিয়ে বললেন বৃদ্ধ মরিয়ম বেগম।

মনিরা এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে নূরের মুখে ধরে বললো–একটু খেয়ে নাও, সুস্থ বোধ করবে বাবা।

তোমরা অহেতুক চিন্তিত হচ্ছে, আমি ভাল আছি। জেনে রাখো আম্মি, আমিও কম নই। ঐ দস্যু ছোকরাটাকে দেখে নেব। সে আমাকে একবার নয় দুবার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে গেছে। আমাকে সে শুধু হত্যাই করতে চায়নি, সে আমাকে চরম আঘাত হেনেছে।

এখন তুমি অসুস্থ বাপ, কাজেই কাউকে নিয়ে চিন্তা করো না। আগেই বলেছি কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করো না। কথাগুলো বললো মনিরা।

মরিয়ম বেগম বললেন– শক্তির পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে শেষে বিপদে পড়বি!

আমি কি বিপদকে ভয় করি যে তুমি এ কথা বলছো? নূর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় কথাগুলো বললো। তারপর পুনরায় বললো–অন্যায় আমি কিছু করিনি। আমি শুধু শায়েস্তা করবো এই এটা আমার কর্তব্য বটে।

নূর, তুমিও দেখছি তোমার আব্বুর মত জেদী হচ্ছ।

জেদী আমি হইনি, এটা আমার জন্মগত চরিত্র–দাতে দাঁত পিষে কথাগুলো বললো নুর।

এমন সময় নূরের ভৃত্য আলী এসে দাঁড়ালো–স্যার, ঐ লোকটা চলে যাবে তাই দেখা করতে চায়।

নূর বললো–কে, রহমান চাচা?

হা স্যার।

ডাকো এখানে।

আলী চলে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো রহমানসহ।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো নূর–রহমান চাচা, তুমি চলে যাবে?

হাঁ, আমার অনেক দূর যেতে হবে। বললো রহমান।

মনিরা অনেকদিন দেখেনি রহমানকে, প্রথমে সে চিনতেই পারছিলো না। নূর যখন তাকে রহমান চাচা বলে ডাকলো তখন সে চিনতে পারলো এবং বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–রহমান তুমি!

হাঁ বৌরাণী, আমি।

তোমার এমন অবস্থা হলো কি করে? রহমানের হাতবিহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো মনিরা।

রহমান বললো–সে অনেক কথা বৌরাণী। সময় করে এক দিন আসবো, তখন বলবো।

মাকে রহমানের সঙ্গে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে দেখে নূর কিছুটা অবাক হয়ে বললো–আম্মি, রহমান চাচাকে তুমি চিনতে পেরেছো?

হ পেরেছি! বললো মনিরা।

রহমান একটু হেসে বললো–তুমি চিনতে পেরেছো আর বৌরাণী চিনতে পারবেন না? এবার তবে যাই ছোট সাহেব।

আচ্ছা এসো। বললো নূর।

রহমান সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মনিরা বললো–রহমান তোমাকে....

হাঁ আম্মি, রহমান চাচা আমাকে.....

উদ্ধার করে এনেছে, তাই না?

যদি মনে করো তাহলে তাই, তবে সব ঐ আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা। তারপর মূল সমস্ত ঘটনা মনিরাও মরিয়ম বেগমের কাছে বর্ণনা করে শোনালো।

সব শুনে বললেন মরিয়ম বেগম–নিশ্চয়ই কোনো দস্যু তোকে নাজেহাল করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা–শুধু নাজেহাল নয়, একেবারে ওকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই চক্রান্ত চলেছে এবং সেই যুবক দস্যু নিশ্চয়ই তোমার সন্তানেরই অনুচর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাগ্যিস রহমান নূরকে দেখেছিলো তাই রক্ষা।

মরিয়ম বেগম পুত্রবধূর কথায় কোনো জবাব দিতে পারলেন না, কারণ তিনি অনেককিছু জানেন যে কারণে তিনি নীরব রইলেন।

নূর পায়চারী করতে লাগলো।

মনিরা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সন্তানের মুখের দিকে।

ভাবছে নূর ঐ তরুণ দস্যুর কথা।

যে দস্যু তাকে একবার নয় দুবার পাকড়াও করে নিয়ে গেছে এবং নানাভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছে। শুধু অপমানিতই নয়, তাকে হত্যা করার কৌশল এঁটেছে। নূর রাগে–ক্ষোভে দাঁত পিষতে থাকে।

মরিয়ম বেগম বললেন–এবার তোর আব্বু এলে তাকে কেমন করে বকুনি দিতে হয় তা দেখে নিবি। আমি এতদিন অনেক কিছু সহ্য করেছি, এখন তার এসব বাড়াবাড়ির উচিত শিক্ষা দেবো।

দাদীমার কথায় নূর হাসিতে ফেটে পড়লো। অদ্ভুত সে হাসি, ওর হাসি যেন থামতেই চায় না।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে নূরের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম দেখছেন, এ যে তার সন্তানেরই প্রতিচ্ছবি। সেই খামখেয়ালী অদ্ভুত হাসি। বড় সুন্দর অদ্ভুত অপূর্ব লাগে ওর হাসিটা। মরিয়ম বেগম তার সন্তানকে বহুবার এমনি করে হাসতে দেখেছেন, আজ সেই হাসির হুবহু নকল যেন নূরের হাসি।

ঠিক মনিরার মনেও সেই ভাবের উদ্বেগ।

স্বামীকে সে এমন ভাবেই হাসতে দেখেছে। বহুবার দেখেছে। বিস্ময়কর সে হাসি, অদ্ভুত সে হাসি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে মনিরা স্বামীর মুখের দিকে স্বামীর হাসিটা যেন তার শরীরে শিহরণ জাগায়, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সে। আজ মনিরা পুত্রের মুখে সেই হাসি দেখছে–অদ্ভুত সুন্দর লাগছে নূরকে….।

নূর আম্মি আর দাদীমাকে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলো–কি দেখছো তোমরা অমন করে? আমার হাসি, তাই না? জানো আম্মি, দাদীমার কথায় আমার বড় হাসি পাচ্ছে আজ। তোমরা ভাবছো কেন হাসির আবার কি হলো? দাদীমা বললেন এবার তার সন্তান এলে খুব করে বকে দেবেন! হায়রে দাদীমা, আজও তোমার সন্তানকে তুমি চিনলে না। হাঙ্গেরী কারাগার যাকে আটকে রাখতে পারেনি, কান্দাই পুলিশবাহিনী যাকে পাকড়াও করেও ধরে রাখতে পারেনি। এমন কি প্রখ্যাত পুলিশসুপার মিঃ জাফরী যার কাছে মাথা নত করেছেন তাকে তুমি বকুনি দিয়ে কাবু করবে? হায়রে দুরাশা। নূর কথাটা বলে সোফায় ধপ করে বসে পড়লো।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে নূরের দিকে।

যেমন পিতা তেমনি পুত্র ভাবছেন তারা ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

নূর বুঝতে পারলো মা ও দাদীমার মনের কথা। উঠে দাঁড়িয়ে বললো– চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

মরিয়ম বেগম বললেন–তোর শরীর ভাল নয়। ড্রাইভার আমাদের পৌঁছে দেবে।

দাদীমা, তোমরা কি মনে করো আমি এত দুর্বল। এতটুকুতেই আমি কাবু হয়ে পড়বো? এসো আমার সঙ্গে। নূর জামটা গায়ে পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য পা বাড়ালো।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম নূরকে অনুসরণ করলো।

সিঁড়ি বেয়ে যখন নামছিলো তখন আলী বললো–স্যার, আপনি এ শরীর নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন!

বললো নূর–এত ভাবতে হবে না, বুঝলি? যা নিজের কাজ করগে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সবাই।

নূর গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দিলো।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগম এবং মনিরা গাড়িতে উঠে বসেছেন।

*

চমকে বিছানায় উঠে বসলো বনহুর।

মিঃ আরমান তার শিয়রে দাঁড়িয়ে।

বনহুর বললো–কি সংবাদ বন্ধু?

সুখবর!

সত্যি বলছেন?

হাঁ।

বলুন?

সেই ব্যক্তি এসেছে?

কোন ব্যক্তি?

যাকে মাঝে মাঝে নিহত মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছিলাম। লোকটা লেবাননবাসী বলে আমার মনে হয়।

তিনি কোথায়?

হোটেলের নিচতলায় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কারও প্রতীক্ষা করছেন। আসুন ঐ জানালার শার্শীর ফাঁকে তাকে দেখা যাবে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে মিঃ আরমানের সঙ্গে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

তাকালো সে নিচের দিকে।

মিঃ আরমান একটা চকলেট কালারের গাড়ির পাশে দণ্ডায়মান একজন ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন আংগুল দিয়ে, বললেন–ঐ সেই ব্যক্তি যাকে মাঝে মাঝে নিহত মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

বনহুর দেখলো অর্ধবয়সী এক লোক, লোকটাকে দেখে স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। কেমন যেন উদ্রান্ত চেহারা। গায়ের রং কটা, চুলগুলো রুক্ষ, চোখের উপরে আঁটা রয়েছে কালো কাঁচের চশমা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছিলো বনহুর।

মিঃ আরমান বললেন–লোকটাকে আমার সন্দেহ হয়, কারণ তাকে প্রায়ই মিসেস জ্যাসিলিনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। যদি কোনো মুহূর্তে কেউ এসে পড়েছে তখন মিসেস জ্যাসিলিনের পাশ থেকে দ্রুত সরে গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে তাকে আমার সন্দেহ হয়।

বনহুর ছোট একটা শব্দ করলো–হু। তার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো।

এরপর ফিরে এলো বনহুর কক্ষে।

মিঃ আরমানও এসে বসে পড়লেন একটা সোফায়।

বনহুর সিগারেট কেসটা বের করে এগিয়ে ধরলো মিঃ আরমানের দিকে।

মিঃ আরমান একটা সিগারেট তুলে নিলেন।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে পুনরায় ফিরে এলো সেই শার্শীর পাশে। একরাশ ধূম্র উদ্গীরণ করে ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো।

মিঃ আরমান বললেন–নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি মিসেস জ্যাসিলিনকে হত্যা করেছে।

সন্দেহ সঠিক হতেও পারে। তবে আমি আরও কিছুটা বেশি ক্লুসগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি মিঃ আরমান। কথাটা বলে ফিরে এলো বনহুর আরমানের পাশে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললো–মিসেস জ্যাসিলিনের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে আরও একজন।

মিঃ আরমান অবাক কণ্ঠে বললেন–সত্যি বলছেন?

হা মিঃ আরমান! আমি পূর্বেই বলছি মিসেস জ্যাসিলিনের হত্যারহস্য উদঘাটন প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। তারই সঙ্গে আরও একটি রহস্যের সমাধান হবে বলে

আমি আশা করছি। এ ব্যাপারে আমি আপনার অজ্ঞাতে আপনার সহযোগিতা পেয়েছি মিঃ আরমান।

মিঃ আরমান বনহুরের কথায় বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন তার মুখের দিকে। তার অজ্ঞাতে তার সহযোগিতা পেয়েছে–সে কেমন কথা!

মিঃ আরমানকে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখে বনহুর হাসলো এবং বললো–আপনার সহযোগিতা ছাড়া আমার এগুনো সম্ভব হতো না। আপনাকে সব জানাবো। শুধু জানিয়েই ক্ষান্ত হবোনা, সব নিজে অনুধাবন করবেন। একটু থেমে বললো বনহু–গভীর এক রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ অন্ধ হসপিটালের অভ্যন্তরে.....

এ আপনি কি বলছেন?

হ যা বলছি সত্য!

এমন সময় আশা এসে দাঁড়ায় সেখানে।

মিঃ আরমান বলে–বসুন গল্প করা যাক।

আশা আসন গ্রহণ করে।

আশা বললো–এমনিভাবে আত্মগোপন করে আর কতদিন থাকা যায় বলুন মিঃ আরমান? হাঁপিয়ে উঠেছেন বুঝি? বললেন মিঃ আরমান।

বনহুর বললো–মিঃ আরমান, আমাদের আত্মগোপন করার ব্যাপারটা আপনার আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না।

তবু যদি সফলতা অর্জন করতে পারেন তাহলে আমিও সার্থক হবো। আমি নিজেই চাই মিসেস জ্যাসিলিনের মৃত্যুরহস্যের উদঘাটন।

বাইরে কোনো শব্দ শোনা যায়।

মিঃ আরমান সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং শার্শীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন–পুলিশপ্রধান ও তাঁর দুজন সহকারী এসেছে। হয়তো তারা কোনো রকম সন্দেহ করে বসেছেন। কাছেই আপনারা ড্রেসিংরুমে গিয়ে আত্মগোপন করুন......

বনহুর আর আশা ড্রেসিংরুমে গেলো।

একটু পরেই দরজা খুলে দিলেন মিঃ আরমান।

পুলিশপ্রধান এবং তাঁর দুজন সহচর প্রবেশ করলেন মিঃ আরমানের কক্ষে। তাঁদের হাতে রিভলভার। পুলিশপ্রধান বললেন–এই কামরায় আমরা তদন্ত চালাবো।

বললেন মিঃ আরমান–আমার কামরায় সন্দেহের কারণ?

কারণ আমরা জানাতে রাজি নই। বললেন পুলিশ সুপার।

মিঃ আরমান দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন–বেশ দেখুন... মুখ কথাটা উচ্চারণ করলেও মনের ভিতরে একটা দুরু দুরু ভাব ছিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন অর্ধবয়সী লোক বেরিয়ে এলো ড্রেসিং রুম থেকে– স্যার, চা না কফি দেবো?

মিঃ আরমান ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠলেও পরক্ষণেই নিজকে সংযত করে নিয়ে বললেন–মাইথিং, তুমি এনাদের জন্য কফি আনো।

মাইথিং কাঁধের তোয়ালেটা একটু ঠিকভাবে সরিয়ে রেখে ড্রেসিংরুমের দিকে ঝুঁকে বললো–মাইডিয়ার, চা নয় কফি তৈরি করে দাও......

পুলিশপ্রধান বললেন–আপনি এখানে এদের স্থান দিয়েছেন মানে চাকর বাকরকে...

স্যার, স্থান না দিয়ে কি করবেন উনি। উনার ফাদার যা কড়া মানুষ। কখন কি অসুবিধা উনার হয় এসব ভালভাবে নজর রাখার জন্যই তো আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তবু কি স্যার স্বস্তি আছে, প্রায়ই উনার ফাদার আসেন দেখাশোনা করার জন্য...

পুলিশপ্রধান হেসে বললেন–আপনার ফাদার দেখছি অত্যন্ত সেকেলে মানুষ।

মিঃ আরমান কিছু বলবার পূর্বেই বলে ওঠে মাইথিং–সেকেলে বলেই তো এত লক্ষ্য তার চারদিকে। শুধু সন্তানের প্রতিই তার লক্ষ্য নয়, আমাদের প্রতিটা

ব্যক্তির উপর তার ভীষণ খেয়াল যেন আমরা কেউ কষ্ট না পাই এবং সে কারণেই হোটেলে ছোট সাহেবের কামরায় স্থান করে। দিয়েছেন।

পুলিশপ্রধান বললেন–এটা বেআইনী, কারণ...

স্যার, একথা তিনি ভালভাবে জানেন অর্থাৎ সন্তানের বেলায় তিনি আইন–বেআইন কিছু মানেন না।

পুলিশ প্রধান কামরাগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন।

পুলিশপ্রধান এবং তার সহকারী দুজনকে কামরা তদন্ত করে দেখার সময় সাহায্য করলো মাইথিং। সমস্ত কক্ষ এবং বাথরুম ড্রেসিংরুম ও বেলকুনি সব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন পুলিশ প্রধান ও তাঁর সহকারীদ্বয়।

অনেক সন্ধান করেও কাউকে খুঁজে পেলেন না তারা। শেষ পর্যন্ত বিফল মনে চলে গেলেন।

পুলিশপ্রধান এবং সহকারীদ্বয় বিদায় গ্রহণ করার পর মিঃ আরমান মাইথংবেশী বনহুরের করমর্দন করে বললেন–ধন্যবাদ, আপনারা নিজেদের বাঁচিয়ে নিতে পেরেছেন।

বনহুর বললো–আপনার সহযোগিতাই আমাদের এভাবে রক্ষা করেছে।

আশা হেসে বললো–একবার নয়, কয়েকবার এভাবে বেঁচে গেলাম আমরা কিন্তু এরপর আর রক্ষা নেই.....

তার পূর্বেই আমরা মিঃ আরমানকে মুক্তি দিয়ে চলে যেতে পারবো বলে আশা করছি।

*

অন্ধ হসপিটাল।

রাত তখন গভীর।

লণ্ডনের কোনো এক গীর্জা থেকে ভেসে এলো রাত তিনটা বাজার সংকেতধ্বনি।

মিঃ আরমান হসপিটালের নিজ ক্যাবিনে বসে কোনো কাজ করছিলেন।

এমন সময় ডাক্তার লোমান প্রবেশ করে বললেন–আপনি এখনও যাননি?

হাতে কিছু কাজ ছিলো শেষ করে নিলাম। বললেন–মিঃ আরমান এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

ডাঃ লোমান বললেন–মিঃ আরমান, আপনি আজকাল বেশি কর্মপরায়ণ হয়ে উঠেছেন।

কেন এ কথা বললেন স্যার? এর পূর্বে কি আমি কাজে তৎপর ছিলাম না?

অবশ্যই ছিলেন তবু সময়মতই ফিরে যেতেন হোটেলে। আজকাল সব সময় আপনাকে হসপিটালেই পাই। এটা আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।

স্যার, রোগীর সেবা করাই আমাদের ব্রত। বললেন মিঃ আরমান।

চক্ষুদান সেন্টারে আজ প্রায় পঁচিশটা চক্ষু গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে সাতজন জীবিত এবং বাকিগুলো মৃত ব্যক্তির। ডাক্তার কথাটা বলে তাকালেন মিঃ আরমানের মুখের দিকে।

স্যার, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছি, এ কারণে সবই আমার জানা আছে।

হসপিটালের লাইফে এতগুলো চক্ষু চক্ষুদান সেন্টারে জমা হয়নি।

হ্যাঁ স্যার, এ কথা মিথ্যা নয়। এত চক্ষু কোনো সময় চক্ষু সেন্টারে জমা হয়নি।

ডাক্তার একটু হেসে বললেন–মিঃ আরমান, চলুন আমি আপনাকে দেখাবো চক্ষুসেন্টার ছাড়াও আরও একটি সেন্টার আছে যেখানে আপনি কেন, হসপিটালের কেউ প্রবেশ করেনি।

মিঃ আরমান অবাক হলেন, বললেন তিনি–এমন কোনো সেন্টার অথবা কেন্দ্র এই হসপিটালে নেই যা আমার দেখা হয়নি। চলুন স্যার, যদি না-দেখা কিছু দেখতে পাই।

চলুন।

ডাক্তারের সঙ্গে এগিয়ে চললেন মিঃ আরমান।

হসপিটালের রোগীরা নিদ্রায় অচেতন।

কোনো কোনো ক্যাবিন থেকে সদ্য অপারেশন করা রোগীর যন্ত্রণাদায়ক আর্তকণ্ঠ ভেসে আসছে।

ডাক্তার বেলকুনি ধরে এগিয়ে গেলেন এবং একটা ছোট সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। সামনে একটা অদ্ভুত যন্ত্র, ডাক্তার যন্ত্রটি ঘুরালেন।

মিঃ আরমানের দৃষ্টিতে কোনোদিন এসব ধরা পড়েনি। আজ নতুন করে দেখছেন তিনি। এগুলো।

ডাক্তার বিস্ময়কর যন্ত্রটা ঘুরালেন, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা ফাঁক হয়ে গেলো।

ডাক্তার আর মিঃ আরমান–অন্য কেউ নেই আশেপাশে।

একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কেমন যেন অদ্ভুত সে শব্দ।

কট কট আওয়াজ।

ডাক্তার প্রবেশ করলেন দেয়ালে সুড়ঙ্গ ধরনের পথের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে নেমে চললো পথ বা সিঁড়িটা।

বেশ কিছু নিচে নামবার পর থেমে গেলো লিফটের মত বস্তু বা যানটা।

মিঃ আরমানকে নেমে আসার ইংগিত করলেন ডাক্তার।

হসপিটালের নিচে ভূগর্ভে এমন একটা কক্ষ আছে ভাবতে পারেন নি মিঃ আরমান।

ডাক্তার মিঃ আরমানকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বললেন–খুব অবাক লাগছে, তাই না?

মিঃ আরমান বললেন–হসপিটালের তলদেশে এমন একটা গবেষণাগার আছে জানতাম না।

জানতেন না বলেই আজ আপনাকে এখানে এনেছি। শুধু দেখবার জন্যই আনিনি, এনেছি। আরও কিছু.... থাক, সব এত তাড়াতাড়ি জেনে কাজ নেই। আসুন সব দেখিয়ে নিই।

মিঃ আরমান ডাক্তারের কথাবার্তায় একটু অবাক হচ্ছিলেন, কারণ ডাক্তারকে তিনি এমন করে কোনোদিন কথা বলতে শোনেননি। আজ তাকে বেশ সচ্ছ মনে হচ্ছে।

চারদিকে নানা ধরনের মেশিন আর যন্ত্রপাতি রয়েছে। মাঝে মাঝে একটা টেবিল, টেবিলের পাশে একটা করে গোলাকার কাঁচপাত্র।

মিঃ আরমান বিস্ময়ভরা চোখে দেখলেন একটা নয়, দুটো নয়, শত শত চোখ ঐ কাঁচপাত্রে তরল পদার্থে জমা রাখা হয়েছে। কেমন যেন অদ্ভুত আর বিস্ময়কর।

মিঃ আরমানকে হতবাক হয়ে কাঁচপাত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার হেসে উঠলেন। কেমন যেন ভয়ংকর সে হাসি।

চোখ দুটো ফিরে এলো মিঃ আরমানের ডাক্তারের মুখে। তিনি এতক্ষণে বুঝতে পারছেন ডাক্তার তাকে কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হিসেবে এখানে নিয়ে এসেছে। দ্রুত কিছু দৃশ্য ভেসে উঠলো আরমানের চোখের সামনে। ডাক্তার দীর্ঘ সময় এই হসপিটালে আছেন। তারই প্রচেষ্টায় নাকি ওই হসপিটাল লণ্ডন নগরীর এক নিভৃত স্থানে স্থাপিত হয়েছে। আজও অন্য কোনো ডাক্তার এই হসপিটালে চাকরী পাননি। যারা পেয়েছেন তারা সবাই ডাক্তার লোমানের সহকারী হিসেবেই পেয়েছেন। ডাক্তার লোমানকে সবাই শ্রদ্ধা করেন, কারণ তিনি একজন দক্ষ চক্ষু চিকিৎসক। শুধু চিকিৎসকই নন তিনি সার্জনও বটে। অল্পভাষী এই ভদ্রলোক

অতি বুদ্ধিমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হসপিটালের রোগীরা ছাড়াও নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারী সবাই ডাক্তারকে শ্রদ্ধা এবং ভয় করে। এহেন ব্যক্তিকে আজ একটা রহস্যময় পুরীতে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না মিঃ আরমান।

কি ভাবছেন মিঃ আরমান?

কিছু না।

অবাক হয়েছেন আমার এই রহস্যময় গবেষণাগার দেখে। তা অবাক হবার কথাই বটে। আসুন আমাকে সহায়তা করুন মিঃ আরমান।

সহায়তা করবো আমি!

হ।

কি কাজে?

একটা অপারেশন হবে।

অপারেশন?

হাঁ অপারেশন। একটা জীবিত ব্যক্তির চোখ তুলে নিয়ে অপর এক ব্যক্তির চোখে মানে জীবিত ব্যক্তির চোখের কোটরে বসিয়ে দিতে হবে। আপনি ছাড়া কেউ পারবে না এ কাজ করতে।

স্যার, তা এখানে কেন?

হসপিটালের প্রকাশ্য স্থানে এ অপারেশন চলবে না।

কারণ।

যার কপাল থেকে চক্ষুদ্বয় তুলে নেওয়া হবে সে চির অন্ধ হয়ে যাবে?

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন মিঃ আরমান–সে চির অন্ধ হয়ে যাবে স্যার?

হাঁ

কিন্তু..

কোনো কিন্তু নয়, একজন অন্ধ হবে, অপরজন যিনি চির অন্ধ ছিলেন তিনি এই সুন্দর পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য উপলব্ধি করবেন।

না না, তা হয় না স্যার।

আপনার কথার মূল্য এখানে নেই।

তাহলে....

হ্যাঁ, অপারেশন হবেই।

তারপর যাকে চির অন্ধ করে দিচ্ছেন তাকে....

তাকে! তাকে কি করবো?

হা হা, তাকে কি করবেন?

হয় হত্যা নয় দূর কোনো দেশে প্রেরণ করবো,...

স্যার, এ কেমন কথা?

মিঃ আরমান, এমন অনেক কাজই হয় যা সাধারণ দৃষ্টিতে মোটেই শ্রেয় মনে হয় না। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

বেশ, আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবো না। বললেন মিঃ আরমান।

ডাক্তার লোমান এবার একটা ইংগিতপূর্ণ শব্দ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোককে নিয়ে আসা হলো সেখানে। লোকটি তেজোদ্দীপ্ত যোয়ান, তার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা। দুজন লোক তাকে দুপাশে ধরে নিয়ে এলো।

আবার ডাক্তার একটা সুইচে চাপ দিলো।

অমনি একটা রোগীসহ বেড় বেরিয়ে এলো দেয়ালের ভেতর হতে। রোগীর দুচোখে পট্টি বাধা।

ডাক্তার বললেন– রোগীর চোখ দুটো তুলে ফেলা হয়েছে, কাজেই…

রোগীর চেহারা দেখে মনে হলো বয়স হলেও বৃদ্ধ নয় এবং বলিষ্ঠ দেহ। রোগীর চোখের বাঁধন খুলে ফেলা হলো।

চমকে উঠলেন মিঃ আরমান, তিনি অস্ফুট ধ্বনি করে বললেন–ইনি সেই ফেরারী আসামী স্মাগলার মিঃ হুইনক্লিক নামধারী শওকত আলী সর্দার।

আপনি দেখছি ওকে দেখেই চিনে ফেলেছেন? বললেন ডাক্তার।

মিঃ আরমান বললেন–চিনবো না? ইনি স্বনামধন্য ব্যক্তি, কে না এনাকে চেনে। বিশেষ করে পত্রিকায় এনার যে ছবি ছাপা হয়েছিলো তা অতি স্পষ্ট। না চিনবার কোনো কথা নয়।

বেশ, যখন চিনেই ফেলেছেন তখন বলতেই হয় সংক্ষেপে। শুনুন,

কিন্তু তার পূর্বে আমি আর একটু বলতে চাই এর সব কথাই আমার জানা আছে। কদিন পূর্বে এই স্মাগলার মিঃ হুইনক্লিক কোথাও ধরা পড়ে যান এবং সেখানে তিনি হারান তার চক্ষুদ্বয়। চোখ দুটোকে উপড়ে নেওয়া হয়েছিলো তারপর তিনি নিখোঁজ হন। একটু থেমে পুনরায় বললেন মিঃ আরমান–এ মুহূর্তে দেখছি তিনি এখানে।

হাঁ, এর চোখ দুটো তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই চোখ দুটোই আবার বসিয়ে দেবো, আপনি এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

কিন্তু যার চোখ তুলে নিচ্ছেন মানে ঐ তরুণ লোকটার কি ঘটবে, একথা একবার ভেবে দেখেছেন ডাক্তার?

এর জন্য আপনি বা আমি নিশ্চিন্ত। যে ব্যবস্থা করতে হয় করবেন আমাদের পেসেন্ট মিঃ হুইনক্লিক। কথাটা বললেন ডাক্তার।

মিঃ আরমান গভীর ভাবে ভাবছেন, যে ডাক্তারকে তিনি অতি সরল সহজ ভেবে এসেছেন এতদিন, সেই ডাক্তারের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলো এক নরপশু। শুনেছিলেন আরমান এই হসপিটাল হওয়ার প্রাক্কালে ডাক্তার লোমান সহযোগিতা করেছিলেন এবং তিনি নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে সর্বক্ষণ হসপিটালের প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকতেন। কথাগুলো শোনার পর মিঃ লোমানের প্রতি একটা শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিলো। যেমন করে গুণী মহৎ জনের প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা জন্মায় তেমনি করে। আর আজ সে শ্রদ্ধা সে বিশ্বাস বালির বাঁধের মত ধসে পড়লো।

মিঃ আরমান, আপনি ভাবছেন এটা অন্যায়। আর আমি ভাবছি মোটেই অন্যায় নয়, কারণ একজনের দৃষ্টিশক্তি নিভে যাবে আর একজন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। মাঝখানে আমি পাবো একলক্ষ ডলার.....ডাক্তারের চোখ দুটো কেমন যেন অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠলো, লোভাতুর শার্দুলের মত।

ডাক্তারকে এ বেশে বা এ ধরনের অবস্থায় দেখবেন কোনোদিন মিঃ আরমান তা ভাবেননি। আজ তিনি নতুনরূপে আবিস্কার করলেন ডাক্তার লোমানকে।

আজ মিঃ আরমান বুঝলেন ডাক্তার শুধু হসপিটালের পেসেন্টদের নিয়েই কাজ করেন না, তার কাজ হসপিটালের তলদেশেও।

বললেন ডাক্তার লোমান–কি ভাবছেন মিঃ আরমান? আর যাই ভাবুন কাজে আমাকে সহযোগিতা করতেই হবে।

না, আমি এমন অন্যায় করতে পারবো না। চক্ষু সেন্টারে বহু চক্ষু জমা আছে অথচ আপনি নতুন এক ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করে....

নির্বোধ, ঐ চক্ষু দিয়েই যদি হতো তাহলে তোমাকে আর এখানে নিয়ে আসতাম না, কারণ ঐ চক্ষু সেন্টারে জমাকৃত চক্ষুগুলোর নার্ভ বিনষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই টাটকা চক্ষুর প্রয়োজন।

মিঃ আরমান আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তাঁর মুখ হা হয়ে গেছে, তাকে আপনি থেকে তুমি বলায় তিনি কিছু মনে করেননি। তিনি যখন শুনলেন চক্ষু সেন্টারে জমাকৃত এতগুলো চক্ষু অকেজো হয়ে গেছে তখন তাঁর মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করলো। কত লোকের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে এই চক্ষুগুলো সংগ্রহ হয়েছে।

মিঃ আরমানের সমস্ত শরীর রাগে–দুঃখে কাঁপছে, এসব কি দেখছেন তিনি এবং কি শুনছেন। সত্যিই তাহলে এতগুলো চক্ষু বিনষ্ট হয়ে গেছে। কতবড় সর্বনাশ.....

কি ভাবছেন মিঃ আরমান?

এ্যা।

অমন গভীরভাবে কি ভাবছিলেন?

ভাবছিলাম কতগুলো লোকের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে আপনি দেশের সর্বনাশ করেছেন....

এ কথা তোমাকে ভাবতে হবে না আরমান। এ অপারেশন তোমার জীবনের শেষ অপারেশন। এরপর আর তুমি ফিরে যাবে না পৃথিবীর বুখে।

মিঃ আরমানের বুকটা ধক করে উঠলো। তিনি ডাক্তারের চোখেমুখে দেখলেন এক কুৎসিত হিংস্র ভাব যা আর কোনোদিন দেখেননি।

এতগুলো কথাবার্তা খুব দ্রুতই শেষ হয়ে এলো। ডাক্তার এবার মিঃ আরমানকে তার হাতে গ্লাবস এবং মুখে মাক্স পরে নিতে বললেন।

মিঃ আরমান দৃঢ়কণ্ঠে বললেন–না, আমি কিছুতেই এ ব্যাপারে রাজি নই।

কি বললে তুমি?

আমি রাজি নই।

তুমি ছাড়া এ কঠিন কাজে সহযোগিতা করার অন্য কেউ নেই, কাজেই তোমাকে চাই–তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে যেমন করে এতদিন করে এসেছে।

এতদিন করেছি কিন্তু এমন ধরনের অন্যায় কাজ করিনি।

বেশি কথা বাড়িও না, তোমাকে যা বলবো তাই শুনতে হবে।

যদি না শুনি...

তাহলে তোমার মৃত্যু....এই এটা তোমাকে হজম করতে হবে। পিস্তল বের করলেন ডাক্তার প্যান্টের পকেট থেকে এবং পিস্তলখানা তুলে ধরলেন মিঃ আরমানের বুক লক্ষ্য করে।

মিঃ আরমান এবার বাধ্য হলেন সহকারীর কাজে সহযোগিতা করতে।

তিনি হাতে গ্লাবস এবং মুখে মাক্স পরে নিলেন।

ততক্ষণে লোক দুজন বলিষ্ঠ লোকটাকে অপারেশান টেবিলে শুইয়ে দিলো।

ডাক্তার এপ্রোণ পরে নিয়ে মাক্স এবং গ্লাবস পরে নিলেন, তারপর অপারেশন টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়কর কক্ষে অদ্ভুত এই পরিবেশ মিঃ আরমানকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তবু তিনি প্রস্তুত হলেন, না হয়ে তো কোনো উপায় নেই। ডাক্তারের পাশে দাঁড়ালেন মিঃ আরমান তাকে সাহায্য করার জন্য।

যে লোকটার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেধে আনা হয়েছিলো তাকে একটা সাদা এপ্রোণে ঢেকে দেওয়া হলো। লোকটা করুণভাবে বারবার নিজের চোখ দুটিকে না তুলে নেবার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন।

কিন্তু ডাক্তার তার কথা কানেও নিলেন না। তিনি পাশাপাশি পেসেন্ট এবং যার চোখ তুলে নেওয়া হবে তাকে শুইয়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

এবার তিনি অস্ত্রোপচারের কাজ শুরু করবেন।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, ঠিক ঐ মুহূর্তে দেয়াল সরে গিয়ে একটা গুপ্তপথ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই গুপ্তপথ দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন পুলিশপ্রধান এবং তার সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ। তাদের সঙ্গে রয়েছে মিঃ আরমানের পুরোনো ভূত আলী।

পুলিশপ্রধান এবং তার সঙ্গীদের হাতে উদ্যত পিস্তল। দৃশ্য লক্ষ্য করে হকচকিয়ে গেলেন ডাক্তার লোমান। তিনি ভেবে পেলেন না এনারা কি করে তার

এই রহস্যময় গবেষণাগারের সন্ধান পেলেন। কি করে তারা তার কাজের হদিস আবিস্কার করলেন। কি করে এই পথের দিশা বা সন্ধান পেলেন। মুহূর্তে সব ভেবে নিলেন ডাক্তার, হাতে তার অপারেশনের অস্ত্র। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে অসহায় ব্যক্তিটার চোখ দুটো তুলে নেওয়া হতো আলগোছে, তারপর দুর্নীতিবাজ অসৎ শওকত আলী সর্দারের চোখে সংযোগ করা হতো কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না।

পুলিশপ্রধান বললেন–খবরদার, একচুল নড়বে না। তিনি পিস্তল চেপে ধরলেন ডাক্তারের বুকে।

পুলিশগণ পিস্তল ধরলো ডাক্তারের দুজন সঙ্গী যারা এতক্ষণ ঐ ব্যক্তিটাকে ধরে রেখেছিলো তাদের বুকে।

মিঃ আরমান হতবাক হয়ে গেছেন। তিনি ভাবতেও পারেননি আলী পুলিশবাহিনী নিয়ে সশরীরে হাজির হবে। আর পথই বা সে চিনলো কি করে, হঠাৎ তার মনে পড়লো বন্ধু বনহুর তাকে বলেছিলো আজ তিনি যেন হসপিটালে ইচ্ছা করেই বিলম্ব করেন। বিশেষ কোনো কারণে সে এ কথা তাকে বলছেন, এটাও সে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলো। এবার মিঃ আরমান বুঝতে পারলেন কেন তাকে হসপিটালে বিলম্ব করার জন্য বলেছিলো এবং কেনই বা তাঁকে রাত অবধি কোনো কাজের বাহানা করে থাকতে বলেছিলো। তবে কি আলী সব জানতে...

মিঃ আরমানের চিন্তাধারায় বাঁধা পড়লো, আলী বলে উঠলো–স্যার, ডাক্তার লোমান দীর্ঘদিন এই হসপিটালে কাজ করে এসেছে, তাকে সবাই মহৎ ব্যক্তি হিসেবেই জানতেন কিন্তু তার এই মহত্বের অন্তরালে ছিলো এক ভয়ংকর রূপ। যে রূপ নিয়ে তিনি হসপিটালের তলদেশে কুকর্ম করে যেতেন। বহু অসহায় ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ডাক্তার লোমান হরণ করেছেন, ঐ দেখুন তার প্রমাণ। ঐ যে কাঁচপাত্র বা চক্ষু রক্ষণাবেক্ষণের পাত্রটা দেখছেন ওটার মধ্যে রয়েছে শত শত ব্যক্তির চোখ। কত নিরপরাধ অসহায় ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তিই না ইনি চিরতরে লুপ্ত করে দিয়েছেন তার পরিসীমা নেই। এবং সেসব দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত ব্যক্তিদের হয় হত্যা নয় পাচার করে দিয়েছেন দেশের বাইরে।

আলীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন পুলিশপ্রধান এবং মিঃ আরমান ও পুলিশগণ। তারা শুধু বিস্মিতই নন, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন।

আলী বলেই চলেছে–সেই অসহায় অন্ধ ব্যক্তিগণ দেশের বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক হিসেবে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন আর যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা মরে বেঁচে গেছেন। এসব চক্ষু ডাক্তার লোমান গোপনে দেশের বাইরে পাঠান এবং তার বিনিময়ে পান কোটি কোটি টাকা। যেমন আজ যে ব্যক্তির চক্ষু তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, তিনি একজন সৎ মহৎ ব্যক্তি। আর যার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য এ প্রচষ্টা তিনি হলেন ফেরারী আসামী স্মাগলার মিঃ হুইনক্লিথ ওরফে শওকত আলী।

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন পুলিশ প্রধান–এ ব্যক্তি সেই দুর্নীতিবাজ দুস্কৃতিকারী যাকে পাকড়াও করে চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিলো?

হা স্যার, এ সেই মহান ব্যক্তি। চোরাকারবারী করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে বসে আছেন। উনি মনে করেছিলেন এর কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই, এমনি করেই লুটে নেবেন জনগণের মুখের গ্রাস, কিন্তু জনগণ এত বোকা বা অবুঝ নয়। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো এবং সুযোগ বুঝেই ওনাকে ওনার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেছে। আলী ক্ষণিকের জন্য থামলো, তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলো–জনগণ আরও বুঝতে শিখেছে দুস্কৃতিকারী অসৎ ব্যক্তিদের হত্যা করে তাকে শায়েস্তা করা হয় না বা যায় না, কারণ তা করলে সে মৃত্যুবরণ করে অতি সহজেই দুনিয়া থেকে রেহাই পেয়ে চলে গেলো। তাই সতর্ক জনগণ আজকাল এই নরপশুদের হত্যা না করে সমুচিত পুরস্কার দিচ্ছে, জীবিত রেখে চোখ তুলে নিচ্ছে আলগোছেন এতে স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বুঝতে পারছেন অসৎ কর্মের ফলাফল কেমন এবং কত ভয়ংকর হতে পারে। যতদিন পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকবেন ততদিন তিল তিল করে উপভোগ করতে সক্ষম হবেন জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়ার কেমন পরিণতি। এই পেসেন্টের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলে এক কোটি টাকা ডাক্তার লোমান পাবেন। শুধু এই একটা নয়, এমন বহু অসৎ কাজ এই ডাক্তারের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

মিঃ আলী, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যে, আপনি এমন একটা গভীর রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করলেন। বললেন পুলিশপ্রধান।

আলী একটু হেসে বললো–আরও একটা ঘটনার পরিসমাপ্তি আজ ঘটবে। যে ব্যাপারে লণ্ডন, নগরীর প্রতিটি লোক প্রতীক্ষা করছেন।

মিঃ আরমান নির্বাক স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন এসব কি দেখছেন এবং শুনছেন। সত্যি কি আলী মানে–বনহুর এসব উদঘাটন করলো। বনহুরের প্রতি একটা শ্রদ্ধাশীল মনোভাব জেগে উঠলো তার মনে।

পুলিশপ্রধান বললেন–মিঃ আলী, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা। আরও নতুন কোনো কিছু জানার জন্য অপেক্ষা করছি।

আলী বললো–শেষ কথা শোনার পূর্বে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিন স্যার। এই সেই খুনী যে মিসেস জ্যাসিলিনকে হত্যা করেছিলো।

সেই রহস্যময় ভূগর্ভে যেন বজ্রপাত হলো।

সবাই তাকালেন আলীর একমুখ দাড়িগোঁফে ভরা মুখখানার দিকে।

পুলিশপ্রধান বললেন–ডাক্তার লোমান মিসেস জ্যাসিলিনকে হত্যা করেছেন?

হাঁ স্যার।

কারণ?

কারণ অত্যন্ত জটিল তবু আমি সংক্ষেপে বলছি। বললো আলী।

পুলিশপ্রধান ডাক্তার এবং তার সঙ্গীদ্বয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ার ইংগিত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশপ্রধানের নির্দেশ পালিত হলো। ডাক্তার একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না, কারণ তিনি ভীষণ ভড়কে গেছেন, নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এতদিনের সব প্রচেষ্টা তাঁর বিফল হয়ে গেলো.... লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন তাঁর তাসের ঘরের মত ভেঙে চুরমান হয়ে গেলে।

পেসেন্ট অবস্থায় স্মাগলার মিঃ হুইনক্লিক নামধারী শওকত সব শুনছিলো কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না, এ কারণেই সে নিশ্চুপ ছিলো এবং নিশ্চুপ থেকেই সব অনুধাবন করছিলো। অবস্থা এখন বড়ই কঠিন তাই কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছিলো শয়তানটার। অবোধ শিশুর মতই এ মুহূর্তে তার অবস্থা। কিছুক্ষণ

পূর্বেও শওকত ভেবেছিলো তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, আবার সে দেখতে পাবে এই সুন্দর পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য। শুধু তাই আবার সে তার গদীতে আসন গেড়ে বসতে পারবে, চলবে তার ব্যবসা পুরাদমে। ….. সব ধূলিসাৎ হয়ে গেলো, নস্যাৎ হয়ে গেলো তার আশা ভরসা। ঐশ্বর্যের ইমারত একদণ্ডে ধসে পড়লো। একটা আর্তনাদ করে উঠলো শওকত আলী সর্দার–যে পাপ আমি করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত আমার হয়েছে। আমাকে আপনারা মাফ করে দেন, আমাকে আপনারা মাফ করে দেন…

কিন্তু শওকত আলী সর্দারের কথায় কেউ কান দিলেন না, তারা মিঃ আরমানের পুরোন চাকর আলীর কথা শোনায় ব্যস্ত।

এবার আলী বললো–মিসেস জ্যাসিলিন লেবাননবাসিনী তার স্বামী মিঃ আলটাবাস মেঙ্ক। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টি হওয়ায় মিসেস জ্যাসিলিন চলে আসেন লণ্ডনে এবং অন্ধ হসপিটালে নার্সের চাকুরী গ্রহণ করেন। অন্ধ হসপিটালে আসার পর তিনি নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে থাকেন। হসপিটালে রোগীর সেবায় নিজকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাক্তার লোমান মিসেস জ্যাসিলিনকে নিজের আয়ত্তে আনেন নানা কৌশলে। জ্যাসিলিন সরলা মহিলা, তাকে আয়ত্তে আনতে দুষ্টচরিত্র লোমানের বেশি বেগ পেতে হয়নি।

তারপর?

মিসেস জ্যাসিলিন এবং ডাক্তার লোমানের মধ্যে একটা প্রীতিভাব গড়ে উঠলো। হসপিটালে তাদের সম্বন্ধ ছিলো ডাক্তার এবং নার্সের আর লোকচক্ষুর আড়ালে নিবিড় সম্বন্ধ ছিলো। ডাক্তার লোমান মিসেস জ্যাসিলিনকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।

পুলিশ প্রধান ও তার সহকারিগণের চোখেমুখে বিস্ময়।

মিঃ আরমান তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। সব শুনছেন তিনি মনোযোগ সহকারে। মিসেস জ্যাসিলিনকে তিনি জানতেন যতটুকু তার চেয়ে শতগুণ জানে আলী।

আলী তখন বলেই চলেছে–ডাক্তার লোমান এবং জ্যাসিলিনের মধ্যে যখন ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় ভাব ধারণ করে তখন মিসেস জ্যাসিলিনের স্বামী মিঃ

আলটাবাস মেস্ক লণ্ডন এসে স্ত্রীর সন্ধান পান এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালান। এ কারণে স্ত্রীর নিকটে মিঃ মেস্ক প্রায়ই হসপিটালে আসতেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিতেন। জ্যাসিলিনের মনটা স্বামীর প্রতি এতবেশি নারাজ হয়ে পড়েছিলো যে, স্বামীকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। এ জন্য প্রায়ই দেখা যেতো স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে একটা রাগারাগি ভাব। হসপিটালে কেউ মিসেস জ্যাসিলিনের স্বামীকে চিনতেন না। শুধু এক ব্যক্তিই জানতেন তিনি হলেন ডাক্তার লোমান এবং যখন জানলেন জ্যাসিলিন তার স্বামীর সঙ্গে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করেছেন তখন ডাক্তার লোমান জ্যাসিলিনকে কৌশলে হত্যা করলেন। অবশ্য জ্যাসিলিনের স্বামীকেও হত্যা করতে পারতেন ডাক্তার লোমান, তাহলেও পথের কাঁটা দূর হতো কিন্তু তা তিনি করেননি। এর কারণ কিছু আছে বলে মনে হয়? বললেন–পুলিশ প্রধান।

হাঁ কারণ ছিলো, মিসেস জ্যাসিলিন শেষের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছিলেন দেশে ফেরার জন্য। আরও একটা কারণ ছিলো–মিসেস জ্যাসিলিনের একটা কন্যা সন্তান দেশে রয়েছে, বিশেষ করে তাকে বেশি করে মনে পড়ছিলো তার। ডাক্তার লোমান মিসেস জ্যাসিলিনকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে তার ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন।

পুলিশপ্রধান হাত বাড়ালেন আলীর দিকে।

আলীও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো।

পুলিশগণ তখন ডাক্তার লোমান ও তার সঙ্গীদ্বয়ের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পেসেন্ট স্মাগলার ফেরারী আসামী শওকত আলী সর্দারকে আপাতত অন্ধ হসপিটালে পুলিশ প্রহরায় রাখা হলো। তবে তার চক্ষু সংযোজনের জন্য নয়, চোখ দুটো তুলে নেওয়ায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষত যতদিন না ঠিক হয় ততদিন তাকে চিকিৎসাধীন রাখা হবে, তারপর তাকে তার উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করা হবে।

মিঃ আরমানের সঙ্গেও করমর্দন করলেন পুলিশপ্রধান।

আলী পুলিশপ্রধানের নিকটে সব কথাই বলেছে। নিজের পরিচয় দিয়েছে– সে একজন ডিটেকটিভ বলে অতি সাবধানে আত্মগোপন করে এই হত্যারহস্যের মূল তথ্য উদঘাটনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলো। আলীর নিকটে ছিলো তার ডিটেকটিভ হিসেবে পরিচয় পত্র, কাজেই লণ্ডন পুলিশপ্রধানের সন্দেহের কোনো কারণ ছিলো না। আলী আরও বলেছিলো মিঃ আরমান তাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাই সে এত বড় দুঃসাহসী কাজে জয়যুক্ত হলো। অবশ্য মিঃ আরমানকেও অনেক কথা গোপন করে তাকে কাজ করতে হয়েছে।

পুলিশপ্রধান অত্যন্ত খুশি হয়েছেন, আলীকে তিনি অভিনন্দন জানালেন অন্তর থেকে।

বিদায় মুহূর্তে পুলিশপ্রধান বললেন–ডাক্তার লোমান অন্ধ হসপিটালের অভ্যন্তরেই শুধু অমানুষিক কাজে লিপ্ত ছিলেন না, তিনি মিসেস জ্যাসিলিনকেও হত্যা করেছেন। একসঙ্গে আমরা দুটি রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হলাম। কিন্তু….

বলুন স্যার।

আপনাকে আমরা ছাড়ছি না।

পুলিশ সুপারের কথায় আলীর দ্বয় ভ্রুকুঞ্চিত হলো।

পুলিশ সুপার বললেন–আপনাকে আরও একটি কঠিন কাজের দায়িত্ব আমরা দিতে চাই, আশা করি আপনি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

বলুন স্যার?

আপনি জানেন দস্যু বনহুর লণ্ডন নগরীতে আগমন করেছে এবং পুলিশমহলের চোখ এড়িয়ে সে আত্মগোপন করে আছে। যে কোনো মুহূর্তে সে লণ্ডন নগরীর ক্ষতি সাধন করতে পারে, কাজেই আমার অনুরোধ দত্যু বনহুর গ্রেপ্তারেও আপনি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন…

একটু হাসলো আলী, তারপর বললো–চেষ্টা করবো স্যার।

চেষ্টা নয়, এ দায়িত্ব আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। পুলিশ প্রধান বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথাটা বললেন।

তখনও আলীর মুখে মৃদু হাসির আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মিঃ আরমানসহ আলী এবার হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এলো।

মিঃ আরমানের গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছিলো। আলী এবং মিঃ আরমান গাড়িতে চেপে বসলো।

বললো আলী–বন্ধু এবার বিদায়। আমাকে লণ্ডন বিমান বন্দরে পৌঁছে দিন, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

মিঃ আরমান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন–হঠাৎ এমন প্রস্তাব কেন বন্ধু? তাছাড়া হোটেলে আপনার স্ত্রী রয়েছেন।

গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললো আলী–লগুনের কাজ আমার শেষ হয়ে গেছে, তাই এবার ফিরে যাবো দেশে। আর ও আমার স্ত্রী নয়–আমার বান্ধবী, বোনও বলতে পারেন, কারণ তার সঙ্গে আমার পবিত্র সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক নেই....

মিসেস আশা আপনার স্ত্রী নন?

মিসেস নয়, কারণ সে এখনও অবিবাহিতা।

তাহলে তিনি একা থাকবে লণ্ডনে?

না।

তবে?

আমাদের উভয়ের প্লেনের টিকেট হয়ে গেছে। আজই সকালের বিমানে আমরা রওয়ানা দেবো।

কিন্তু.... হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিঃ আরমান বললেন–বিমান তো সাতটা দশে বিমান বন্দর ত্যাগ করবে এখন সাড়ে ছটা বাজে। আশা মানে আপনার বান্ধবী রয়েছেন হোটেলে, তাকে আনতে হবে।

না, তাকে আনতে হবে না, সে বিমান বন্দরে চলে গেছে। আমিই তাকে বলেছিলাম ঠিক সময়মত বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকার জন্য।

আশ্চর্য মানুষ আপনি। সত্যি আপনাকে যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। আপনি বিমানের টিকেট করবার পূর্বে কি বুঝতে পেরেছিলেন এই সময়ের মধ্যে কাজ সমাধা করতে সক্ষম হবেন।

হাঁ, আমি জানতাম এবং আমার ভরসা ছিলো এই সময়ের মধ্যেই আমি কাজ শেষ করতে পারবো। অবশ্য আমাকে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হয়েছে।

আশ্চর্য! ড্রাইভ করতে করতে শব্দটা উচ্চারণ করলেন মিঃ আরমান।

আলী বললো–আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। মানুষের যা করণীয় আমি তাই করেছি বা করছি। আশাকে বলেছি মিঃ আরমানের সঙ্গে দেখা হবে বিমান বন্দরে, কাজেই আশাকে আপনি বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও পারছেন।

আর আমার বলবার কিছু নেই। বন্ধু বলে আমার কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রথমে আমি আপনাকে মানে আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি এ জন্য আমি লজ্জিত।

আমি কৃতজ্ঞ মিঃ আরমান, আপনি আমার আসল পরিচয় জানার পরও নিশ্চুপ ছিলেন এবং আমাকে সবকাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করে এসেছেন। ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে লক্ষ টাকার অধিকারী হতে পারতেন এবং লাভ করতেন এক সম্মানসূচক পদবী।

আমি আজ যে সম্মানে ভূষিত হলাম তার কোনো পরিসীমা নেই। স্বয়ং দস্যু বনহুর আমার বন্ধু, একথা আমি ভাবতে যে আনন্দবোধ করছি তা লক্ষ টাকার চেয়ে অনেক বড়, অনেক বেশি।

অনেক ধন্যবাদ মিঃ আরমান। এই নিন একটি চিহ্ন আমি আপনাকে দিয়ে গেলাম। আলীবেশী বনহুর নিজ আংগুল থেকে একটা আংটি খুলে মিঃ আরমানের আংগুলে পরিয়ে দিলো।

যখন বনহুর মিঃ আরমানের আংগুলে আংটি পরিয়ে দিলো তখন আরমান দক্ষিণ হাতে হ্যাঁণ্ডেল চেপে ধরে রাখলো, মনে তার একটা উচ্ছল আনন্দ আর ব্যথা একসঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করছিলো–স্বয়ং দস্যু বনহুর তার আংগুলে আংটি পরিয়ে দিলো।

এ যে তার জীবনে এক পরম স্বপ্নলগ্ন।

ঠিক সময় প্লেন বিমান বন্দর ত্যাগ করলো।

মিঃ আরমান আশা ও বনহুরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

একটা গভীর ব্যথা হৃদয়ে অনুভব করলেন মিঃ আরমান।

এক সময় একা ছিলেন, তখন এত খারাপ লাগতো না তার। আজ নতুন করে নিঃসঙ্গ লাগছে, বড় একা মনে হচ্ছে নিজেকে।

মিঃ আরমান হোটেলের কামরায় বসে নিজ হাতের আংগুলে পরা আংটির দিকে তাকালেন। ইলেকট্রিক আলোতে উজ্জ্বল একটা ছটা বেরিয়ে আসছে আংটিটা হতে। উজ্জ্বল এক হীরকখণ্ড, মহামূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিঃ আরমান একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বনহুর আর আশাকে নিয়ে বিমানখানা যখন লণ্ডনের আকাশ পেরিয়ে ইথুরিয়ার আকাশে এসে পৌঁছেছে, ঐ মুহূর্তে পুলিশপ্রধান তার অফিসে এসে বসতেই টেবিলে নজর পড়লো একটি সবুজ রঙের ইনভেলাপ, ঠিকানায় তারই নাম। পুলিশপ্রধান চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে খুলে ফেললেন। মাত্র কয়েক লাইন লেখা আছে চিঠিখানায়

আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না, কারণ যাকে আপনি খুঁজে ফিরছেন আমিই সেই ব্যক্তি। —- দস্যু বনহুর

পুলিশপ্রধানের মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করলো। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি তার অফিসকক্ষের টেবিলের শূন্য এ্যাসট্রেটার দিকে। যে দস্যু বনহুরকে লণ্ডন পুলিশবাহিনী হন্তদন্ত হয়ে খুঁজে ফিরছেন সেই ব্যক্তিই হলো কিনা ডিটেকটিভবেশী আলী.... যে এমন একটা গভীর রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছে। কোথায়, কোথায় সেই আলী..... সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রধান রিসিভার তুলে নিলেন হাতে। মিঃ আরমানকে টেলিফোন করলেন, জানালেন তিনি ব্যাপারটা।

মিঃ আরমান বললেন–যখন আমরা তার আসল পরিচয় জানতে পেলাম তখন সে লণ্ডন ত্যাগ করে চলে গেছে। সকালের বিমানে সে লণ্ডন ত্যাগ করেছে।

পুলিশপ্রধান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তিনি টেলিফোনে বিমান বন্দরে জানিয়ে দিলেন সংবাদটা এবং ওয়্যারলেসে সেই বিমান চালককে জানাতে নির্দেশ দিলেন, যেন আরাকান বিমান বন্দরে পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখেন, স্বয়ং দস্যু বনহুর ঐ বিমানে যাচ্ছে।

বনহুর ও আশা পাশাপাশি বসেছিলো।

প্লেনের সাউণ্ড বক্সে প্রতিধ্বনিত হলো কথাগুলো। বনহুর এবং আশা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো একবার। তারা বুঝতে পারলো লণ্ডন পুলিশ অফিস থেকে সব জানানো হয়েছে।

বিমানযাত্রীদের মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো।

তারা আতঙ্কগ্রস্তভাবে এ ওর দিকে তাকাতে লাগলো, সবার চোখেমুখে ভীতি ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

মহিলাগণ পুরুষদের মুখে সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগলো। নিজ নিজ মূল্যবান অলংকার গোপনে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সবাই।

বিমান চালকের বুকটা ধক করে উঠলো। যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য লণ্ডনবাসী হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যে দস্যু বনহুরকে একনজর দেখার জন্য লণ্ডনবাসী উন্মুখ, যে দস্যু বনহুরের ভয়ে লণ্ডনবাসী আতঙ্কিত সেই দস্যু বনহুর রয়েছে এই প্লেনে কম কথা নয়।

মহিলা যাত্রীগণ নিজ নিজ স্বামী বা আত্মীয় স্বজনের পাশে সরে এলো। না জানি দস্যু বনহুর তাদের কি ক্ষতি সাধন করে বসে।

বিমানখানা তখনও আরাকান জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। আরাকান বিমান বন্দরে অবতরণ করবার উদ্দেশ্যেই বিমানখানা এগুচ্ছে এবার।

বনহুর বুঝতে পারে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকে নিচের দিকে।

এবার বিমানখানা সমদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চললো। বনহুর ছোট্ট একটা কাগজ বের করে কিছু লিখলো, তারপর আশার হাতে গুঁজে দিলো সকলের

অলক্ষ্যে।

আশা পড়লো হাতের মুঠায় আড়াল করে।

বনহুর লিখেছে–আশা, তুমি ফিরে যাও। আমাকে এই সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় নিতে হবে।

— বনহুর।

আশার চোখ দুটো ছলছল হয়ে উঠলো। সে নিজকে অতি কষ্টে সংযত রেখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

দৃষ্টি বিনিময়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালো আশা তাকে।

বনহুর উঠে এগিয়ে গেলো প্লেনের সম্মুখ ভাগে।

পাইলটের আসনের পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। রিভলভার চেপে ধরলো পাইলটের পাঁজরে, চাপাকণ্ঠে বললো–একটুও নড়বে না, তাহলে প্লেনসহ সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হবে।

পাইলট হকচকিয়ে গেলেও সে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো না, কারণ এমন ধরনের একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো সে। তার সহকারী পাইলটগণ বেশ ঘাবড়ে গেলো, তারাও নির্বাক। বিমানচালক এখন রিভলভারের মুখে, কাজেই নিশ্চুপ থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

বনহুর একটানে একটা প্যারাসুট বের করে নিলো, তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়লো প্লেনের সামনের দরজা দিয়ে। এ দরজা দিয়ে বিমান চালকগণ বিমানে আরোহন এবং অবতরণ করে থাকেন।

এত দ্রুত কাজ করলো বনহুর যে বিমানের যাত্রীগণ মোটেই টের পেলো না।

বনহুর যখন নিজ আসন থেকে উঠে যাচ্ছিলো তখনও কারও মনে সন্দেহ জাগেনি যে, ঐ ব্যক্তিই দস্যু বনহুর। কারণ যাত্রীগণ বনহুকে এক ভীষণ চেহারার মানুষ বলে মনে করেছিলেন এবং সেজন্যই বিমান চালকের পাশে পৌঁছতে বনহুরের কোনো অসুবিধা হয়নি।

যে মুহূর্তে বনহুর পাইলটের পাশের থাক থেকে প্যারাসুট টেনে নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়েছিলো, ঐ মুহূর্তে প্লেনখানা হঠাৎ কাৎ হয়ে যায়। পাইলট কৌশলে সামলে নেয় এবং তখনই মাইক্রোফোনে জানিয়ে দেয় দস্যু বনহুর সমুদ্রবক্ষে লাফিয়ে পড়েছে, আপনারা এখন নিশ্চিন্ত.... বিপদ কেটে গেছে....আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই আরাকান বিমান বন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম হবো।

বনহুর ততক্ষণে প্যারাসুট নিয়ে আকাশপথে শূন্যে নেমে আসছে। নিচে সমুদ্রের গর্জন, উপরে সীমাহীন আকাশ।

চেষ্টা করছে বনহুর তীরের দিকে নামতে।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে প্যারাসুট বনহুরকে নিয়ে ভেসে চললো। সমুদ্রে তখন ভীষণ আলোড়ন ছিলো, কাজেই দমকা হাওয়া বইছিলো অত্যন্ত জোরে। প্যারাসুট হাওয়ায় ভেসে এগুতে লাগলো।

তারপর প্যারাসুটখানা বনহুরকে নিয়ে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় নামিয়ে দিলো। ধূ ধূ বালুকারাশি আর থৈ থৈ জলোচ্ছাস।

সমুদ্রের গর্জন আর ঝড়ো হাওয়া।

প্যারাসুট বনহুরকে বেশ কিছুটা টেনে নিয়ে চললো বালুর মধ্য দিয়ে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর।

সমুদ্রের ভীষণ উত্তাল ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে বনহুর আল্লাহর নিকট শুকরিয়া করলো। ঐ ঢেউগুলো তাকে গ্রাস করতো।

প্যারাসুটখানা একস্থানে গুটিয়ে রেখে সে অগ্রসর হলো।

মাথার উপর সুর্যের প্রচণ্ড তাপ আগুন ছড়াচ্ছে। বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠলো। আশেপাশে কোনো বৃক্ষ বা তরুছায়া নেই।

বনহুর লক্ষ্য করলো দূরে বহু দূরে কালো রেখার মত লাগছে। হয়তো বা বনজঙ্গল অথবা গ্রামাঞ্চল হবে। যেমন করেই হোক, ঐ কালো রেখার মত স্থানে পৌঁছতে হবে।

এখন যদিও ক্ষুধা-পিপাসা নেই কিন্তু এক সময় এমন অবস্থা হবে তখন ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে সে। সীমাহীন বালুকারাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না, কাজেই সে এগিয়ে চললো ঐ কালো রেখা লক্ষ্য করে।

পথ যেন শেষ হতে চায় না।

বনহুর চলেছে তো চলেছেই। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আসে তার পা দুখানা।

বেলা পড়ে যায়।

সন্ধ্যার হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে।

সমুদ্রের গর্জন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কারণ সমুদ্র ছেড়ে বহুদূর এসে গেছে বনহুর।

কালো রেখাটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এবার বনহুর বুঝতে পারে কালো রেখাটা কোনো শহর বন্দর নগর বা গ্রামাঞ্চল নয়, বন জঙ্গলে ভরা ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর যতটুকু জোরে সম্ভব পা চালালো।

সন্ধ্যার পূর্বে তাকে ঐ বনজঙ্গলে ঢাকা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। নইলে দারুন শীতে তার দেহটা জমে বরফ হয়ে যাবে।

ভাবে বনহুর, এতক্ষণ আশা কান্দাই না পৌঁছলেও ঝাম বিমান বন্দরে পৌঁছে গেছে। নিশ্চয়ই সে তার নিজের বাসস্থানে ফিরে যেতে পারবে। আশা আজ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। তাকে আর কোনো অসুবিধা পোহাতে হবে না। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বনহুরের বুক চিরে। আশার ব্যাপারে বনহুর নিশ্চিন্ত।

প্রায় এসে গেছে বনহুর।

কারো রেখা এখন ছোট বড় পাহাড়ে রূপ নিয়েছে। অনেক ঘন বন জঙ্গল ভরা পাহাড়গুলো।

বনহুর যখন পাহাড়ের কোলে এসে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে।

ক্ষুধা-পিপাসাও বোধ করছে বনহুর ভালভাবে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। একটা পাহাড়ের কোল ঘেষে বনহুর বসলো।

রাত বাড়ছে।

ক্লান্তি আর অবসাদে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে তার। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত পা কুকড়ে আসছে যেন। বনহুরের শরীরে কোট প্যান্ট টাই পরা থাকায় একটু রক্ষা। হাতখানা মাথার তলায় দিয়ে শুয়ে রইলো বনহুর চোখ বন্ধ করে।

কখন যে বনহুর গভীর ন্দ্রিায় অচেতন হয়ে পড়েছে খেয়াল নেই তার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো।

বনহুর চোখ মেলতেই একটা দীপ্ত উজ্জ্বল আলো তার নজরে পড়লো।

চোখ রগড়ে উঠে বসলো বনহুর।

ভাল করে তাকালো সে।

দেখলো পাহাড়গুলোর অদূরে জঙ্গলের পাশে একটা আলোকরশি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একটা অদ্ভুত শব্দও হচ্ছে শো শো করে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো, এ ধরনের যান সে মঙ্গল গ্রহে দেখেছিলো।

বিস্ময় আরও বাড়লো বনহুরের।

তবে কি মঙ্গল গ্রহ থেকে যানটা নেমে এসেছে। আরও আশ্চর্য হলো বনহুর যানের দরজা খুলে গেলো। একটা সিঁড়ি আকার বস্তু নেমে এলো যানের মধ্যে হতে। সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো তিনজন লোক।

চিনতে বাকি রইলো না বনহুরের। সেই অদ্ভুত পোশাক। এই পোশাকে মঙ্গল গ্রহে সে বহু লোক দেখেছিলো। একটা অভূতপূর্ব নেশা বনহুরকে উত্তেজিত করে তোলে। তার চোখের নিদ্রা ছুটে যায়, আলগোছে লুকিয়ে পড়ে।

তিনজন লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওদের চলার ভঙ্গী কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের।

বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো।

ওরা তিনজন অনেক এগিয়ে আসছে।

কেমন যেন শূন্যে ভেসে ভেসে এগুচ্ছে ওরা।

প্রায় বনের কাছাকাছি এসে পড়লো। ওরা নিকটবর্তী হতেই বনহুর শুনতে পেলো কথা বলছে তিনজন। অদ্ভুত ওদের ভাষা। বনহুর কিছু বুঝতে পারছে না।

ওরা তিনজন কি উদ্দেশ্য নিয়ে বনের দিকে এগুচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছে না বনহুর। সে ভালভাবে শুধু লক্ষ্য করে চলেছে। তিনজনের হাতেই ধারালো অস্ত্র বা ঐ ধরনের কিছু হবে।

আলোকরশ্মিতে বনভূমির বেশ কিছু অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বনহুর ভাল করে লক্ষ্য করছে ওরা একেবারে বনের ভিতরে প্রবেশ করলো।

এবার বনহুর মুহূর্তে চিন্তা করে নিলো, তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একখানা করুণ। অসহায় মুখ, সে মুখ অন্য কারও নয়–দিপালীর…

না জানি দিপালী মঙ্গল গ্রহে কেমন আছে।

জীবিত আছে না মৃত্যু ঘটেছে কে জানে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, ওদের মোটেই দেখা যাচ্ছে না। এবার বনহুর দ্রুত আড়াল থেকে বেরিয়ে ঐ আলোক–স্তম্ভটির দিকে দৌড়ে গেলো।

আলোকরশ্মির উজ্জ্বল নীলাভো আলোকচ্ছটায় চারিদিক টলমল করছে।

আলোকস্তম্ভ বা যানটা থেকে যে সিঁড়ি ঝুলছিলো বনহুর সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

অদ্ভূত সে যানটা।

বনহুর তাড়াতাড়ি একটা তাকের পেছনে লুকিয়ে পড়লো! বসবার মত বেশ একটু ফাঁকা ছিলো, তাই ফাঁকটাকে বনহুর তার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলো।

মাত্র কয়েক মিনিট, ফিরে এলো ওরা তিনজন। বনহুর লক্ষ্য করলো ওদের হাতে কিছু গাছের ডাল রয়েছে। সে বুঝতে পারলো ওরা কোনো গবেষণার জন্য পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে। সবুজ ডালপালা নিয়ে হয়তো কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে।

যে স্থানে বনহুর বসেছিলো ঐ স্থানেই ওরা ডালগুলো রেখে দিলো।

ভাগ্য বলতে হবে তারা কেউ বনহুরকে লক্ষ্য করলো না। আর লক্ষ্যই বা করবে কেন তাদের মতে তো কোনো সন্দেহ নেই, যে এই নির্জন স্থানে কেউ আসতে পারে।

একজন চালকের আসনে বসলো।

একটি খোলসে আবৃত করলো নিজের দেহটা।

একটা সুইচ টিপলো লোকটা।

তার পূর্বে কিছু কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে।

তার একবর্ণও বুঝতে পারলো না বনহুর, কারণ সে ভাষা ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু, জাপানী বা বাংলা এসব কোনো ভাষার একটিও নয় নতুন এক ভাষা।

বনহুর অবশ্য এ ভাষার সঙ্গে পরিচিত কিছুটা রয়েছে, কারণ মঙ্গল গ্রহে সে একবার ভাগ্যক্রমে গিয়েছিলো এবং সেখানে সে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেছিলো। কথাবার্তা কিছুটা অনুধাবন করলো কিন্তু বুঝতে পারলো না।

এরা মঙ্গল গ্রহ থেকে না অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে তারও কোনো হদিস নেই তবে এ ধরনের যান সে মঙ্গল গ্রহে দেখেছিলো।

বনহুরের স্মৃতির আকাশে সব ভেসে বেড়াচ্ছে, তবে কি এই যানটি মঙ্গল গ্রহ থেকে অবতরণ করেছে? হয়তো আবার বনহুর দেখা পাবে দিপালীর। না জানি সে এতদিনে কেমন অবস্থায় আছে।

একটি ঝাঁকুনি লাগতেই বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। যানটির আলো নিভে গেছে, শুধু পেছনে একটি আলোর রেখা ছুটে চলেছে। উল্কাবেগে ছুটে চলেছে যানটি।

এক নিমেষে পৃথিবী ছেড়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে যানটি উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সব অস্পষ্ট লাগছে ভিতর থেকে।

বনহুর তার হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো।

রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

অন্ধকারেও বনহুরের ঘড়িটা সময় সংকেত জানালো। একটা আশার আলো বনহুরের মনে বিপুল নাড়া দিচ্ছে। সত্যিই সে নতুন এক জগৎ আবিস্কারে চলেছে। এর পরিণতি কি দাঁড়াবে, কি তার ভাগ্যে ঘটবে সেদিকে বনহুরের খেয়াল নেই, কোনোদিন ছিলোও না। নির্ভীক বনহুর, সব সময় বিপদকে আলিঙ্গন করাই তার নেশা।

কত কি ভাবছে বনহুর।

আর যদি ফিরতে না পারে তাহলে তার আস্তানা, তার অনুচরগণ, মনিরা, নূর....জাভেদ, নূরী সব মুখ ছাপিয়ে একটি মুখ স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো–তার আম্মা, তার স্নেহময়ী জননীর মুখ....

ঝাপসা হয়ে এলো বনহুরের চোখ দুটো।

কিন্তু সব চিন্তা মুহূর্তের জন্য।

তখনই সেসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সজাগ হয়ে উঠলো।

চারদিকে নক্ষত্রের মেলা।

অপূর্ব এক রাজ্যে যেন তারা এসে পড়েছে।

নীল শুধু নীল এ রাজ্য।

যানটি এতক্ষণ সোজা খাড়াভাবে সা সা করে এগুচ্ছিলো, আবার ধীরে ধীরে কাত হয়ে গেলো। সামনে একটি গোলাকার রৌপ্য বস্তু পরিলক্ষিত হলো।

বনহুর স্পষ্ট দেখতে না পেলেও আবছা আবছা নজরে পড়ছে। যানটি সেই গোলাকার বস্তুটি লক্ষ্য করে এগুচ্ছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, গোলাকার বস্তুটি ক্রমেই দৃষ্টির অগোচরে মিশে যাচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারলো গোলাকার বস্তুটি আসলে কোনো বস্তু নয় একটি গ্রহ। তবে কি এটাই মঙ্গল গ্রহ।

পৃথিবীর মানুষ এখনও সন্দিহান, অন্য কোনো গ্রহে মানুষ বসবাস করে কিনা। কিন্তু বনহুর জানে মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মতই নদী–নালা–পাহাড়–পর্বত–বন-জঙ্গল এবং জীব–জন্তু আছে, তবে পৃথিবীর বস্তুর রূপ আলাদা মঙ্গল গ্রহের বস্তু সমূহের রূপ আলাদা।

বনহুর নিজে এসব পরিদর্শন করেছে, কাজেই সে জানে মঙ্গল গ্রহেও এদের মত মানুষ বাস করে।

পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়েছে, এখনও অন্য কোনো গ্রহে তারা যেতে পারেনি, হয়তো একদিন পারবে, তখন জানবে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে তারা কোনো অংশে কম নয়। যে যানটিতে এ মূহুর্তে বনহুর অবস্থান করছে তা অতি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির চিন্তাধারার ফসল। তা হলে মঙ্গল গ্রহে বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার সব আছে।

বনহুরের চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যানটি সেই গোলাকার রৌপ্য বস্তুটার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখন যানটি অতি ধীরে ধীরে এগুচ্ছে বলে মনে হলো বনহুরের। যানটি যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে এগুচ্ছে।

বনহুর এবার দেখলো যানটি অতি লঘুভাবে এসে নেমে পড়লো। ওরা তিনজন দরজা খুলে নেমে পড়লো আলগোছে।

বনহুর এবার বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

ওরা তিনজন যানটি থেকে নেমে যেতেই বনহুর যানের ভিতর থেকে লক্ষ্য করলো আশেপাশে কেউ নেই।

কি ভাবে ওরা যানের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো লক্ষ্য করেছিলো বনহুর। এবার ওরা তিনজন নেমে যেতেই সে নেমে পড়লো দ্রুতগতিতে।

এ সেই দেশ যে দেশে সে একবার এসেছিলো।

মঙ্গল গ্রহ।

সেই বেগুনী রঙের সমারোহ। সেই গাছপালা ফল লতা সব বেগুনী রং। সোনালী আবছা আলো। চারদিকে মূল্যবান পাথরের স্তূপ। ঝোঁপঝাড়ও আছে, টিলাও আছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি একটা উঁচু অদ্ভুত পোশাক পরা টিলার পাশে আত্মগোপন করলো। কারণ ঐ তিন ব্যক্তির সঙ্গে আরও দুজন নারী এগিয়ে এলো যানটির দিকে।

ওরা যানটার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং বের করে আনলো পৃথিবী থেকে আনা ডালপালাগুলো। মঙ্গল গ্রহের গাছপালার রং আর পৃথিবীর গাছপালার রং সম্পূর্ণ আলাদা। বেগুনী রঙের গাছপালার সঙ্গে সবুজ রঙের ডালগুলো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ওদের আলোচনা চললো, তারপর ওরা যানটির পাশ থেকে চলে গেলো সবাই মিলে।

এবার বনহুর আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়লো। বারবার মনে পড়ছে দিপালীর কথা। সে কেমন আছে কোথায় আছে কে জানে। দিপালীর মুখখানাই মনের পর্দায় ভেসে উঠছে কিন্তু কোথায় আছে দিপালী কে জাণে।

বনহুর ঝোঁপঝাড় আর টিলার আড়ালে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললো।

বিরাট প্রান্তর।

শুধু ছোটবড় পাথুরিয়া টিলা।

মাঝে মাঝে ঝকঝকে পাথর স্তূপ। ঝাপসা আলো স্নিগ্ধতায় ভরপুর। সূর্যের প্রখরতা এখানে নেই। যেন স্বপ্নপুরী বা স্বপ্নের দেশ।

বনহুর অবাক হয়ে দেখছে।

একটি ফলের গাছ হতে কয়েকটি ফল পেড়ে নিয়ে খেলো সে।

মুগ্ধ নয়নে বনহুর সব দেখছিলো।

তার শরীরে কোট প্যান্ট–টাই পায়ে বুট। পৃথিবীর স্বাভাবিক পোশাকে সজ্জিত রয়েছে এখনও সে। প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়লেও তার পোশাকের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। তবে কিছুটা ধূলোবালি লেগে গিয়েছিলো তার পোশাকে।

বনহুরকে অজানা দেশে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিলো। তার মুখমণ্ডলে অপূর্ব এক ভাবের উন্মেষ।

অপূর্ব স্বাদ ফলগুলোর।

তৃপ্তি সহকারে বনহুর খেয়ে নিলো।

এবার বড় প্রফুল্ল লাগছে নিজেকে।

বনহুর এগুলো।

নিজকে সে হাল্কা মনে করছে। একটুও কষ্ট লাগছে না। সীমাহীন শক্তি তার শরীরটাকে সতেজ করে তুললো। বনহুর খুঁজে ফিরছে দিপালীকে। প্রান্তর পেরিয়ে একটা পাহাড়, বনহুর পাহাড়টার তলদেশে এসে দাঁড়ালো।

পাহাড়ের গায়ে ছোটবড় বেগুনী রঙের গাছপালা, বড় সুন্দর বড় মনোরম অপূর্ব এক জগৎ যেন এটা।

বনহুর এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ তার কানে এলো অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি।

একটি নারীকণ্ঠের ভায়ার্ত আর্তনাদ।

বনহুর দ্রুত পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে গেলো। উপরে উঠে তাকালো সে নিচের দিকে দেখলো একটা নদী তার পাশে বেগুনী ফসলের ক্ষেত। কয়েকজন তরুণী শুভ্র বসনে সজ্জিত হয়ে ঐ ক্ষেতের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে

একটা অদ্ভুত ধরনের ভয়ংকর জীব নদীবক্ষ থেকে উঠে এসেছে এবং আক্রমণ করেছে আচম্বিতে।

জীবটা ভীষণ আকার।

কতটা জলহস্তীর মত দেখতে।

তরুণীদল যতই এলোমলোভাবে দৌড়াচ্ছে ততই জীবটা তেড়ে আসছে তাদের আক্রমণ করতে। এই ধরে ফেলে আর কি।

বনহুর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাহাড় থেকে দ্রুত নেমে এলো এবং ক্ষিপ্রহস্তে জীবটাকে ধরে ফেললো। বনহুরের পকেটে ছিলো একটা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। বনহুর ওকে জাপটে ধরবার পূর্বে ছোরাখানা বের করে বাটে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বের হয়ে এলো বাটের ভিতর থেকে।

জীবটাকে ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ করে দিলো জীবটার কণ্ঠনালীতে। শুরু হলো বনহুরের সঙ্গে জীবটার ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি।

তরুণীদল হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। দুচোখে তাদের বিস্ময়, কে এই মহাপুরুষ হয়তো ভাবছে ওরা মনে মনে।

বনহুরের সঙ্গে জীবটা পেরে উঠলো না। ছুরিখানা এসে তার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হয়েছে, তারপর বনহুরের মত শক্তিশালীর কবলে জীবটা হিমসিম খেয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত জীবটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

তরুণীরা আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো বনহুরের দিকে।

জীবটা পড়ে যেতেই বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর একটা হাত দিয়ে ছোরাখানা তুলে নিয়ে অপর হাতে ছোরার বাটে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বাটের মধ্যে প্রবেশ করলো।

এবার বনহুর ছোরাখানা পকেটে রেখে ফিরে তাকালো তরুণীদের দিকে।

বাম হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেললো সে।

তরুণীরা ভয়ভীতি আর বিস্ময় নিয়ে তাকাচ্ছে। এতবড় একটা ভয়ঙ্কর জীবকে পরাজিত করেছে যে সে কম নয়, হয়তো বা কোনো দেবদূত হবে মনে করে ওরা।

বনহুরের পোশাকও ওদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। এমন পোশাক তারা দেখেনি কোনোদিন।

বনহুর এগুতেই ওরা দৌড়ে পালাতে গেলো।

বনহুর ডাকলো।

ওরা কেউ কেউ ফিরে তাকালো বটে কিন্তু আবার সোজা হয়ে দৌড়ে পালাতে লাগলো।

এবার বনহুর শুধু হাতের ইশারা করে ডাকলো।

ওরা থেমে পড়লো।

আর না এগিয়ে ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

বনহুর যেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলো। একবার দুবার তিনবার। তরুণীদের মধ্য হতে একজন এগিয়ে এলো। অবশ্য তার চোখেমুখে একটা ভীতিভার পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।

বনহুর হেসে বললো–আমাকে তোমাদের কোনো ভয় নেই....মুখে কথা বললো এবং হাতের ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করলো।

তরুণীটি বনহুরের কথা বুঝলো না।

সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলো।

বনহুর হেসে বললো–এসো কোনো ভয় নেই। দুটি হাত বাড়িয়ে দিলো।

এবার তরুণী বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এলো।

অন্যান্য তরুণীও এগুলো এবার।

তরুণীর মধ্য হতে একজন কিছু বললো।

অন্যান্য তরুণীর মুখেচোখে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভাব।

বনহুর বুঝলো মেয়েটি সবার হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। বনহুর হাসলো একটু।

তরুণীরা কি যেন নিজেরা বলাবলি করলো।

একজন কিছু বললো।

বনহুর কথা না বুঝলেও এটুকু বুঝলো তারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বারবার আংগুল দিয়ে ঐ ভয়ংকর মৃত জীবটাকে দেখাচ্ছে।

একটু একটু করে অতি নিকটে এসে পড়লো ওরা। বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমা তরুণীর মধ্যে তেমন কোনো দ্বিধা ছিলো না। সে স্বচ্ছ ভাবে বনহুরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এবার বনহুরকে সঙ্গে করে নিয়ে চললো ওরা।

শুভ্র বসনে দেবীমূর্তির মতই মনে হচ্ছিলো তরুণীগণকে। পৃথিবীর নারীদের চেয়ে এরা অনেক বেশি সুন্দরী। রেশমের মত রাশিকৃত সোনালী চুল, ডাগর ডাগর দুটি চোখ কালো কালো ভ্রুজোড়া, দেহের রং ফিকে গোলাপী। অপূর্ব বলা যায়।

সূর্যের প্রখরতা নেই বলেই মঙ্গল গ্রহের বৃক্ষলতাগুলো এবং মানুষের রঙের মধ্যে নেই কোনো উগ্রতা। স্নিগ্ধ এবং লাবণ্যভরা সব কিছু।

বনহুরের বড় ভাল লাগে সবকিছু।

এগিয়ে চলেছে বনহুর।

পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

সবাই ওরা বনহুরকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ওদের কাছেও বনহুর এক বিস্ময়, কারণ মঙ্গল গ্রহের পুরুষগণও কতকটা মহিলাদের মতই নরম সরম,

আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছে বনহুর, মঙ্গল গ্রহের পুরুষদের দাড়িগোফ সব হাল্কা রেশমের মত, কতকটা মেয়েলি ধরণ বলা যায়।

বনহুরকে ওরা অবাক চোখে দেখছে। কিন্তু বলতে চেষ্টা করছে ওরা, বনহুরও বলতে চাইছে কিন্তু কেউ কারও ভাষা বোঝে না, কাজেই মহামুস্কিল হলো।

বনহুর বলতে চাইছে আমাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো বিপদে পড়বে না তোর তোমাদের অভিভাবকগণ আমাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন তো? কিন্তু হায়রে ভাগ্য, একটি বর্ণও যদি ওরা বুঝতো। শেষ পর্যন্ত অনেকদূর এগুনোর পর বেশ কিছু অদ্ভুত ধরনের বাড়ি নজরে পড়লো।

শুধু পাথরের খণ্ড জোড়া লাগিয়ে অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। বনহুর বেশ বুঝলো পূর্বে যে স্থানে সে পৌঁছেছিলো, এ স্থান সে স্থান নয়। পূর্বের স্থান ছিলো বিরাট একটি প্রাসাদ। সে রাজপ্রাসাদেই আছে দিপালী, বনহুরের সব কথা আজ নতুন করে মনে পড়ছে। পথে আজ যে পাথরগুলো ছড়িয়ে আছে, সে পাথরগুলোর মতই বহু পাথর দিপালী আঁচলে কুড়িয়ে সংগ্রহ করেছিলো।

সত্যই পাথরগুলো মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর বুকে এমন ধরনের পাথর কোনোদিন দৃষ্টিগোচর হয় না, বিশেষ করে পথে–ঘাটে তো নয়ই।

বনহুর নানা ধরনের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ তার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেলো।

তরুণীরা এসে হাজির হলো একটি বাড়ির উঠানে। একজন তাকে ডাকলো একটা শব্দ করে।

তখনই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক মহিলা। তার সমস্ত শরীরে শুভ্র ড্রেস। তার পেছনে একটি পুরুষ।

মহিলার মাথায় অদ্ভুত ধরনের মুকুট।

দক্ষিণ হাতে একটি বিস্ময়কর বস্তু।

তরুণীগণ মহিলাকে লক্ষ্য করে নত হয়ে কুর্ণিশ জানালো তার হাত দুখানা তারা দুপাশে ঝুলিয়ে রাখলো, শুধু মাথাটাই নত করলো মাত্র।

মহিলা তরুণীদের সঙ্গে অদ্ভুত একটি লোককে দেখে অবাক হলো এবং রাগান্বিত হলো। সে এবং তার সঙ্গী পুরুষটি রাগান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

বনহুর কুর্ণিশ জানালো তরুণীদের মত করে।

মহিলা নিজ হাতের বস্তুটিকে মুখেরকাছে তুলে ধরে বনহুরকে লক্ষ্য করে ফুদিতে গেলো।

তরুণীদের মধ্য হতে প্রথম তরুণী ছুটে গিয়ে মহিলার পাদু খানা জড়িয়ে ধরলো। তারপর কি যেন বললো।

অন্যান্য তরুণীও একসঙ্গে নানাভাবে কিছু বর্ণনা দিতে লাগলো।

তরুণীদের কথাবার্তা শুনে মহিলার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠলো। তার সঙ্গীর চোখেমুখেও পরিলক্ষিত হলো একটা ভয়ার্ত ভাব। ওরা দুজন তখন নিজেরা কিছু বলাবলি করে নিয়ে তাকালো। বনহুরের দিকে। কিছু পূর্বে যে দৃষ্টিতে ছিলো ক্রোধান্বিত ভাব সে দৃষ্টিতে এখন এমন একটা ভাব। পরিলক্ষিত হলো যে দৃষ্টি বনহুরকে করলো আশান্বিত।

মহিলা এবার এগিয়ে এসে বনহুরের দিকে হাত বাড়ালো এবং কিছু বললো।

বনহুর কথাগুলো বুঝতে না পারলেও হাত বাড়িয়ে মহিলার করমর্দন করলো। বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হলো সে। মহিলার হাতখানা তুলোর মত নরম তুলতুলে। বনহুরের কঠিন হাতের উপর কে যেন একখণ্ড নরম মোম রাখলো।

বনহুর বুঝতে পারলে তারা তাকে মেনে নিলো। এবার মহিলা হাতের বস্তুটি অপর এক জনের হাতে দিলো।

এটা কোনো মারাত্মক অস্ত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অস্ত্রটি ফুঁ দিয়ে কার্যকরী করা হয়। মহিলাটি বনহুরকে শত্রু মনে করে মারাত্মক অস্ত্রদ্বারা হত্যা করতে চেয়েছিলো। যখন সে জানতে পারলো লোকটি শত্রু নয় মিত্র এবং সে একজন

তেজোদ্দীপ্ত বীর পুরুষ, তখন মহিলা তার হাতের মারাত্মক অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য।

বনহুর মহিলার অভিনন্দন গ্রহণ করলো।

ওকে নিয়ে গেলো ওরা তাদের বাড়ি বা ঘরের মধ্যে। পাকার সুমিষ্ট ফল এনে খেতে দিলো। বনহুর এত ফল দেখে অবাক হলো।

মহিলাটি বসলো তার পাশে।

অন্যান্য সবাই দাঁড়িয়ে রইলো, এমনকি মহিলার সঙ্গী পুরুষটিও দাঁড়িয়ে রইলো, তাদের পাশে।

মহিলা কিছু বললো।

বনহুর ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করলো সে কিছু বুঝতে পারছে না।

মহিলা এবং তার সঙ্গের পুরুষটি তরুণীদের লক্ষ্য করে কিছু বললো।

তারা ওদের কথা শুনে বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো বনহুরের।

বনহুর নিজে একটি ফল নিলো হাতে এবং সবাইকে ফল খেতে ইংগিতে অনুরোধ জানালো। ওরা সবাই একটি করে ফল তুলে নিলো বনহুরের অনুরোধ রক্ষার্থে।

সবাই মিলে ফল খাওয়ার পর্ব চললো।

এরপর বনহুরকে পানীয় পান করতে দেওয়া হলো। বনহুর ইশারায় বললো, ও সব সে পান করে না। ফলগুলো রাসালো ছিলো। কাজেই পানি পান করার কোনো আগ্রহ ছিল না বনহুরের মধ্যে।

বনহুর এবার ভাবছে কি করা এখন তার উচিত। পরিবেশটা তার কাছে বেশ লাগছে।

হঠাৎ তরুণীগণ চলে গেল তারপর নিজ হাতে একটি অদ্ভুত ধরনের বীণা নিয়ে হাজির হলো। বীণাহাতে সুন্দর করে দাঁড়ালো ওরা।

মহিলা কিছু বললো তরুণীদের লক্ষ্য করে।

এবার তরুণীদল বীণায় ঝংকার তুললো। বড় সুন্দর, বনহুর যেন মোহমুগ্ধ হয়ে পড়লো। এক সময় বীণার ঝংকার থেমে গেলো।

বনহুর সবাইকে মাথা নত করে অভিনন্দন জানালো। জানালো ধন্যবাদ।

মহিলা বনহুর ও তার সঙ্গীকে নিয়ে ঐ পথে এগুলো যে পথ দিয়ে কিছু পূর্বে নদীতীর হতে তরুণীগণসহ বনহুর এসেছিলো।

বনহুর বুঝতে পারলো সেই জীবটাকে তারা দেখতে যাচ্ছে।

মহিলা একটি উঁচু স্থানে দাঁড়ালো।

তারপর মুখের কাছে হাত রেখে একটা অদ্ভুত শব্দ করলো, সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের বাড়িলো হতে বেরিয়ে এলো নারী–পুরুষ, তবে নারীর সংখ্যাই বেশি, পুরুষ নিতান্ত কম।

মহিলাটি এদের লক্ষ্য করে কিছু বললো। বেশ কিছুক্ষণ বর্ণনা দিলো জীবটার এবং বনহুরকে পাশে নিয়ে দেখলো।

যে জনগণ নারী–পুরুষ এসে ভিড় জমিয়েছিলো তারা সবাই বনহুরকে লক্ষ্য করে অভিবাদন জানালো।

বনহুর নিজেও হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলো।

এরপর তারা বনহুর সহ নদীতীরে এসে জীবটাকে দেখে অবাক হলো।

মৃত জীবটার পাশে যাওয়ার সাহস তাদের হচ্ছিলো না। ওরা নিজেরা কিছু বলাবলি করছিলো, চোখেমুখে বিস্ময় এবং ভায়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। বারবার কৃতজ্ঞাতপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে ওরা বনহুরের দিকে।

বনহুর এবার মৃত জন্তুটার কাছে গেলো এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখালো সে আর আক্রমণ চালাতে পারবে না।

এবার মহিলা এবং তার সঙ্গী এসে জীবটার দেহ স্পর্শ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন আনন্দসূচক প্রতিধ্বনি করলো। এবার অন্যান্য সবাই এসে মৃত জীবটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করে দেখতে লাগলো এবং নানা ধরনের আলোচনা করতে লাগলো।

সবাই এরপর বনহুরকে ঘিরে এক অদ্ভুত ধরনের অভিনন্দন বুঝি পৃথিবীর মানুষ করতে জানে না। এরা বড় সরল সহজ, এদের কণ্ঠস্বর মধুর। দেহের গঠন অত্যন্ত সুঠাম, অপূর্ব।

বনহুরকে এরা সমাদরে আপ্যায়ন করলো।

ফলমূল ছাড়া এরা অন্য কোনো খাদ্য খায় না। পানীয় পান করে এরা সর্বক্ষণ। জমিতে ফলমূল জন্মে, ফল খায়। রান্নার কোনো হাঙ্গামা আছে বলে মনে হলো না বনহুরের।

ওরা নারী–পুরুষ সবাই বনহুরকে দেবদূত বলে মনে করছে। পূজা করছে ওরা ফুল দিয়ে, দেবতাকে যেমন করে ওরা পূজা করে। নতুন পরিচ্ছেদে বনহুরকে ওরা সজ্জিত করেছে।

অবাক হয় না বনহুর, কারণ ওরা পৃথিবীর মানুষ নয়, ওরা অস্বাভাবিক মানুষ। ওদের মধ্যেও শিক্ষা আছে কিন্তু আমাদের মত বই খাতা কলম নিয়ে নয়, ওরা শিক্ষা লাভ করে হাতে নাতে।

বনহুরকে নিয়ে মহিলা একদিন রাজদরবারে হাজির হলো।

মহারাজ এক অদ্ভুত মানুষ।

পুরুষ না নারী বোঝা মুস্কিল।

বনহুর তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করলো কিভাবে তারা মহারাজকে অভিবাদন জানায়, সেভাবে সেও জানালো।

মহারাজ তাকে সিংহাসনের পাশের আসনে বসালো এবং নিজে আসন ত্যাগ করে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো। এক তরুণী থালার উপর সুন্দর মহামূল্যবান একটা হীরার হার এনে রাজার সামনে ধরলো।

মহারাজ হীরার হারটি তুলে নিয়ে পরিয়ে দিলো বনহুরের গলায়।

রাজদরবারের কোন ছাদ ছিলোনা।

উজ্জ্বল দ্বীপ্ত আলোতে দরবারকক্ষ ঝলমল করছে।

সেই আলোতে বনহুরের গলার মালা বা হীরার হারটি থেকে এক আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো।

একপাশে বাদ্যকরগণ অদ্ভুত ড্রেসে সজ্জিত হয়ে সঙ্গীতে ঝংকার তুলেছে। এ সুর যেন স্বপ্নপুরীর এক মোহময় সুরের ঝংকার।

হীরক খচিত থালায় ফুল নিয়ে একদল তরুণী প্রবেশ করলো। ফুলগুলো ফিকে বেগুনী অথচ বড় সুন্দর।

সমস্ত দরবারকক্ষে একটি সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো।

আর থালা থেকে ফুলগুলো নিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলো বনহুরের মাথার উপর।

বনহুর ভাবেনি এখানে এমন অভ্যর্থনা পাবে সে। সত্যি সে ভাগ্যবান, অতি ভাগ্যবান যাকে বলে। হাসে বনহুর আপন মনে।

নাইবা বুঝলো ভাষা ওদের, তবু তো ওরা তাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে। বনহুর ভাবছিলো অনেক কিছু, হঠাৎ তার কানে এলো অতি পরিচিত এক কণ্ঠের প্রতিধ্বনি–রাজকুমার আপনি….

বনহুর চমকে চোখ তুললো।

[পরবর্তী বই রূপালী সূর্য]

পূর্ববর্তী: